২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বকেয়া মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনের দাবিতে

কর্মচারী-শিক্ষক মহামিছিলে প্লাবিত দক্ষিণ কলকাতা

শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ধর্মতলা থেকে হাজরাপার্ক— প্রকাশ্য রাজপথে দৃপ্ত মিছিলে সমবেত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা রচনা করলেন আন্দোলন সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়ের। বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন/কমিটি গঠন সহ সর্বমোট ৬ দফা জরুরী দাবি আদায়ে এবং রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস করার প্রতিবাদে এই মহামিছিলের উদ্যোক্তা ছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ রাজ্য সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী ১৫টি সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজপথে অবস্থান বা মিছিলে শামিল হওয়া সদস্য বন্ধুদের কাছে কোনো নতুন ঘটনা না হলেও ২০১১ পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এত বিপুল সংখ্যক কর্মচারীদের অংশগ্রহণ সংগঠন-আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ২০১৪-র ১০ সেপ্টেম্বর-এর কর্মসূচীতে লাগাতার ৪০ মাস ধরে বঞ্চিত হতে থাকা কর্মচারীরা সংগঠন নির্বিশেষে তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন কলকাতা ও শিলিগুড়ির কেন্দ্রীয় সমাবেশ দুটিতে, রচিত হয়েছিল সংগ্রামের এক নতুন ইতিহাস। কিন্তু ঘুম ভাঙেনি বর্তমান রাজ্য সরকারের তাই রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা রয়েছেন রাজপথে তাঁদের বকেয়া দাবি আদায়ের লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও ১৪টি সংগঠন, সর্বমোট ১৫টি সংগঠন। সংগঠনগুলি হল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন, কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কমেনস ফেডারেশন, সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন, জয়েন্ট কাউন্সিল অব অ্যাকশন অব ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ, কে এম ডব্লু এন্ড এস এ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন।

৭০-এর আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসকে পরাজিত করে

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
ফেব্রুয়ারি ২০১৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৩ তম বর্ষ □ দশম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

এবারের একুশের শপথ

বছরে ৩৬৫ টি দিনের মধ্যে একটি দিন ২১ ফেব্রুয়ারি। যা প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে। খ্রীষ্টীয় ক্যালেন্ডারের পাতায় ২০১৫ বার এইভাবে মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু ১৯৫২ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আর শুধু একটি তারিখ থাকেনি— একটি ঐতিহাসিক দিনে পর্যবসিত হয়েছে। কারণ ১৯৫২ সালের ঐ দিনটিতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় রাজপথ ভিজে গিয়েছিল বরকত-সালাম-রফিক-জব্বার সহ ১৪ জন বীর শহীদের রক্তে। মাতৃভাষা বাংলার স্বাধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় পুলিশের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তাই গুলি সেদিন কারও পিঠে লাগেনি, লেগেছিল বুকে অথবা মাথায়। মাতৃভূমির জন্য আত্মত্যাগের অসংখ্য বীরগাথা ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বেই। কিন্তু মাতৃভাষার জন্য জীবনদান আক্ষরিক অর্থেই বিরল ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। '৫২-র অমর ভাষা শহীদদের স্মরণে কবি অন্নদাশঙ্কর রায় তাই লিখেছিলেন— ''.... মানুষ ওরা, নয়কো পাখী/বলবে নাকো নয়া জবান/গুলির মুখে দাঁড়ায় রুখে/অকাতরে হারায় জান/রক্তে রাঙা মাটির পরে/ওড়ে ওদের জয় নিশান।'' ১৯৫২-র এই ঘটনা কোন তাৎক্ষণিক 'কলরব' ছিল না। ছিল মাতৃভাষার সরকারী স্বীকৃতির দাবিতে জানকবুল লড়াই-এর সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ। যার সূচনা হয়েছিল আরও আগে। ধর্মের ভিত্তিতে খন্ডিত দেশ 'পাকিস্তান'-এর আত্মপ্রকাশের একবছরের মধ্যেই। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে যখন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ঘোষণা করলেন 'Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan', সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত ছাত্ররা প্রতিবাদে গর্জে উঠে বলেছিল No-No। ছাত্র সমাজের এই প্রতিবাদ ভিত্তিহীন ছিল না। কারণ অবিভক্ত পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪.৪ শতাংশ ছিলেন বাংলাভাষী। অথচ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে নারাজ ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনও ছিলেন জিন্নারই দলে। তাঁরা চেয়েছিলেন বাংলাভাষী মানুষের ওপর উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে। অথচ সেই সময় পাকিস্তানের মাত্র ৭ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। বাংলাভাষী মানুষ সেদিন প্রতিবাদ করেছিলেন উর্দুভাষার সৌন্দর্য ও গুরুত্বকে অস্বীকার করার জন্য নয় তাঁরা চেয়েছিলেন নিজেদের মাতৃভাষার শৃঙ্খল-মোচন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতি তত্ত্বের জনক মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ তাঁদের প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ দিতে চান না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের পরিবর্তে, ভাষাভিত্তিক বিকাশমান জাতিসত্তাকে অবদমিত করে এক নয়া শোষণের জালে তাঁদের আবদ্ধ করতে চান। কারণ ভাষা যদি না বাঁচে সংস্কৃতি বাঁচে না। আর সংস্কৃতি না বাঁচলে জাতিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। জাতিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ না ঘটলে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ শোষণমূলক ব্যবস্থাটাই চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হয়। তাই ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রফিক, বরকত, সালাম, শফিউর, জব্বারের রক্ত পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি জাতিসত্তার অবদমিত ক্ষোভে অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে যে দাবানলের সৃষ্টি করেছিল, দীর্ঘ দু-দশক পরে ১৯৭১ সলের ২৫ মার্চ তারই তেজোদ্দীপ্ত প্রভায় আত্মপ্রকাশ করেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ। তাই তো যাঁদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ মৌলবাদী শোষণ থেকে মুক্তির দিশা দেখিয়েছিল, তাঁদের স্মরণ করেই ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী রচনা করেছিলেন তাঁর আবেগতাড়িত সঙ্গীত—''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?'' আব্দুল গফ্ফার চৌধুরীই তাঁর এক রচনায় বলেছিলেন, ''দেশ অনেক সময় মানুষকে মেলাতে পারেনি। ধর্মও পারেনি, কিন্তু সংস্কৃতি অনেক সময় মানুষকে মিলিয়ে দিয়েছে। এজন্য সংস্কৃতি, বিশেষত গণসংস্কৃতির ওপর বারবার আঘাত এসেছে। স্বৈরাচারী শাসক গণসংস্কৃতিকে সব থেকে বেশি ভয় পায়। কারণ গণসংস্কৃতির মধ্যেই সেই শক্তি থাকে যা মানুষকে জাগায়।'' জাতিসত্তা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিনও বলেছিলেন, একটি জনগোষ্ঠীর পরিচয় ঘটে তার ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি দিয়ে।

আনন্দের বিষয় হল, একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আর শুধু বাংলাদেশের ভাষা শহীদ দিবস নয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আজ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিচালনাধীন ইউনিসেফের বিশেষ অধিবেশন ১৮৮টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থনের ভিত্তিতে এই স্বীকৃতি লাভ করে ২১ ফেব্রুয়ারি। মাতৃভাষা বাংলার জন্য আত্মবলিদানের আরও একটি উজ্জ্বল নিদর্শন স্বাধীন ভারতের আসামের বারাক উপত্যকার শিলচর। ১৯৬১ সালের ১৯ মে মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতির দাবিতে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ সমাবেশে গুলি চালায় স্বাধীন ভারতের পুলিশ। শহীদের মৃত্যুবরণ করেন সুকোমল, কানাইলাল, কমলাসহ ১১ জন। এখানেও শহীদ কমলা ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রচিত হয়েছে সঙ্গীত—'সে যে বলে গেল জান দেব, তবু জবান কখনও দেব না, ভাত বেড়ে রেখো, ফিরে এসে খাবো, না এলেও মাগো ভেবো না।' শেষপর্যন্ত আসাম সরকারও বাংলাভাষার দাবিকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শহীদের আত্মবলিদান স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির সন্ধান দিতে পারেনি। বাংলাদেশেও না, আসামেও না।

যে আত্মপরিচয়ের সঙ্কট থেকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত, সেই আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ধ্বজা উড়িয়েছিল। কিন্তু একটি ধর্মীয় মৌলবাদ পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রের বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশকে মৌলবাদীরা, এমনকি সাম্রাজ্যবাদও মেনে নিতে পারেনি। তাই শিশু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনা অভ্যুত্থান সংগঠিত করে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে আওয়ামি লীগ পরিচালিত সরকারের পতন ঘটানো হয়। তারপর বিভিন্ন রূপে ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয়েছে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাঠামো, তাকে বানচাল করে সংবিধানে রাষ্ট্র-ধর্ম হিসেবে ইসলামকে যুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি হল, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় শাসক শ্রেণীর ভাড়াটে রাজাকার বাহিনী জনগণের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল, তার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গণদাবি উঠেছে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি চাই। কিন্তু বসে নেই জামাত-ই-ইসলামি সহ বিভিন্ন উগ্রপন্থী মৌলবাদী সংগঠন। তাদের লক্ষ্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়াকে বানচাল করা। তাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং নাশকতামূলক কাজ ক্রমবর্ধমান। এমনকি মূলস্রোতের রাজনৈতিক দল বিএনপিও যুক্ত হয়েছে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে। আমাদের দেশের মাটিকেও ব্যবহার করা হচ্ছে এই কাজে। বর্ধমানে খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ কাণ্ডের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ্যে এসেছে।

আসামেও বাংলাভাষী মানুষ এখনও নিরাপদে নেই। তাঁদের জীবন ও জীবিকার ওপর আক্রমণ এবং জন্মভিটে থেকে উচ্ছেদ করার বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র বারংবার পরিলক্ষিত হয়েছে।

সারা বিশ্বে প্রধান ৮টি ভাষার অন্যতম হল বাংলা ভাষা। প্রায় ২২ কোটি মানুষ বাংলাভাষায় কথা বলেন। আমাদের দেশেও জনসংখ্যার বিচারে হিন্দীর পরেই বাংলার স্থান। পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারী মানুষের ৮৪ শতাংশ বাংলাভাষী। সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সোসাইটির অভিমত হল— বাংলাভাষা পৃথিবীর সব থেকে মাধুর্যমণ্ডিত ভাষা। এতদ্সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাংলাভাষা কখনও কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। এর কারণও কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে শ্রেণী রাজনীতির মধ্যেই। কারণ স্বাধীন ভারতে ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, বাংলাভাষী মানুষের রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত হয় প্রধানত পশ্চিমবাংলা। আর এই পশ্চিমবাংলাই হয়ে ওঠে শোষণমূলক একচেটিয়া পুঁজিবাদী-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির বিরোধী বামপন্থী শক্তির প্রধান কেন্দ্র। ফলে শাসক শ্রেণীর চক্ষুশূল এই রাজ্যের প্রধান ভাষাটির দশা হয়েছে দুয়ো রানীর মতোই। আসলে ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার বিকাশ একটি জাতিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটাতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত রাজনৈতিক চেতনার ভারসাম্যমূলক সংমিশ্রণ। একমাত্র এই পথেই শাসক ও শোষণের সমস্ত চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করা যায়। নচেৎ শোষক শ্রেণী প্রতি আক্রমণের জন্য তাদের অস্ত্রাগার থেকে নতুন নতুন অস্ত্র ব্যবহার করবেই। ওপার ও এপার দুই বাংলাই আজ যার শিকার। তাই এবারের একুশের শপথ হোক শোষণহীন সাম্যবাদী ভাবনায় জারিত সুস্থ জাতীয়তাবাদের উন্মেষের চর্চা ও অনুশীলন। □

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সরকার বাহাদুরের শিল্প চর্চা

নিন্দুকগণ যাহা খুশি বলিতে পারেন। কারণ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আয়াসসাধ্য কার্য হইল অপরের নিন্দা করা। ইহাতে শ্রম অথবা পুঁজি কোনোটিই ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয় না। স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গেও এইরূপ নিন্দুকের সংখ্যা নগণ্য নয়। বাসে-ট্রামে-ট্রেনে-অফিসে-আদালতে, মহল্লার রোয়াকে-চায়ের দোকানে সর্বত্রই ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে নিন্দাঝড় তুলিতে ইহারা সিদ্ধহস্ত।

যেমন বিগত কতিপয় বৎসর যাবৎ নিন্দুকগণের প্রধান ইস্যু হইল পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পরিস্থিতি। উহারা 'আদা-জল খাইয়া' রাজ্য সরকারের নিন্দা করিতেছেন এবং প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কোনোরূপ কোনো শিল্প হইতেছে না। ইহা যে সর্বৈব মিথ্যা এবং নিতান্ত অপপ্রচার তাহা নিন্দুকগণ ব্যতিরেকে অপরাপর অংশের জনগণ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেছেন। কারণ সরকারী মহলের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ প্রায়শই শিল্প লইয়া বিস্তর চর্চা করিতেছেন এবং ফলতঃ প্রতি নিয়ত শিল্প সংক্রান্ত নূতন নূতন সংজ্ঞা বাজারজাত হইতেছে। কার্যক্ষেত্রে ইহার নীট ফল একটি বৃহদাকৃতি শূন্য হইলেও, বা কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীগণের কর্মহীনতার সমস্যার বিন্দুমাত্র সুরাহা না হইলেও সরকারী গল্পে শিল্প-গরু গাছের মগডালে উঠিয়া বসিতেছে ইহাই বা কম কি? শাস্ত্রে রহিয়াছে 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং'। ইহা অনুসরণ করিয়া সরকারী বিজ্ঞপ্তি হইতে পারে 'ভাষণে বেকারত্ব বিলুপ্তি'। বেশ অভিনব ব্যাপার হইবে। অ্যাডাম স্মিথ, মার্কস, রিকার্ডো, কেইনস, ফ্রিডম্যান, অমর্ত্য সেন প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ 'বেকারত্ব' লইয়া বিপুল চর্চা করিলেও 'ফুৎকারে' কোটি কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও যে সম্ভব তাহা অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা না পারিলেও, মদীয় রাজ্যের সরকার তাহা কার্যকরী করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার জন্য আমাদের গর্ববোধ করা উচিত। এমনকি 'নোবেল-শ্রী' নামক কোনো অভিনব পুরস্কার রাজ্য সরকারকে প্রদান করিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তরে আমরা গণ-সুপারিশও পাঠাইতে পারি। কিন্তু এমন ইতিবাচক চিন্তা না করিয়া নিন্দুকগণ শুধু নিন্দাবাদের কীর্তন করিতেছেন!

আসুন, আমরা স্মরণ করি বিগত তিন বৎসরের কিঞ্চিতধিক সময়ে শিল্পের কতগুলি নতুন শাখা আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হইয়াছে। যেমন সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য (মতান্তরে পাগলু ড্যান্স) এমত সমস্ত কিছুই আর্ট বা কলা অর্থে নয় ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পরূপে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমাদের জানানো হইয়াছে। বটেই তো। একজন বেকার যুবক পাড়ার সরস্বতী প্রতিমার বিসর্জন শোভাযাত্রায় 'ডি জে' সহযোগে 'পাগলু ড্যান্স' করিলে তাহাকে কর্মহীন বলা যায় কি?

সম্প্রতি অপর যে শাখাটি উন্মোচিত হইয়াছে, তাহাও যৎপরোনাস্তি আকর্ষণীয়! শাখাটি হইল শিল্পের 'তেলে ভাজা' শাখা। 'তেলে ভাজার' দোকান খুলিলেই ভবিষ্যতে দশতলা অট্টালিকা নির্মাণের সামর্থ্য প্রাপ্তি হইবে বলিয়া সরকার বাহাদুর আশ্বস্ত করিয়াছে। অস্যার্থ মহল্লায় মহল্লায় সারিবদ্ধ তেলে ভাজার দোকান গড়িয়া তুলিতে হইবে! এই অভূতপূর্ব প্রস্তাবেও নিন্দুকেরা সরব হইয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন সকলেই যদি তেলে ভাজা বিক্রয় করে, তাহলে ক্রেতা হইবে কাহারা? এই ধাঁধার সমাধান অতীব সহজ। 'তেলে ভাজা' শিল্পের বিশেষীকরণ ঘটিবে। কেহ শুধু বেগুনী ভাজিবে, কেহবা আলুর চপ অথবা পেঁয়াজি। বেগুনী উৎপাদক ও পেঁয়াজি উৎপাদকের পরস্পরের মধ্যে পণ্য বিনিময় ঘটিবে। ২টি বেগুনী = ১টি পেঁয়াজি অথবা তদ্বিপরীত। ইহার মধ্য দিয়া মানব সমাজের অতীত ঐতিহ্যও স্মরণ করা সম্ভব হইবে। দ্বিতীয়ত মুদ্রার পরিবর্তে পণ্য বিনিময় ঘটিলে তোলাবাজগণও 'তোলা' তুলিতে পারিবে না। ফলে শান্তি শৃঙ্খলাও রক্ষিত হইবে। উপরন্তু ধারাবাহিক তেলে ভাজা ভক্ষণে উদর বিদ্রোহ করিবেই। ফলে চিকিৎসা কেন্দ্র ও ঔষধ বিক্রয় কেন্দ্রের প্রয়োজন হইবে। অর্থাৎ আরও চিকিৎসক, সেবাব্রতী ও কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্য দিয়া নূতন কর্মসংস্থানের প্রবাহ সৃষ্টি হইবে। সরকার বাহাদুরের এবংবিধ সিদ্ধান্তে আমাদের প্রভূত উৎফুল্ল হওয়া উচিত। আমরা শুধু প্রস্তাব রাখিতেছি, তেলেভাজা শিল্পে প্রবেশাধিকারের জন্য তেলেভাজা সিলেকশন কমিশন বা টি এস সি চালু হউক। □

১৪ ফাল্গুন, ১৪২১

শোক সংবাদ

তরুণ আচার্য

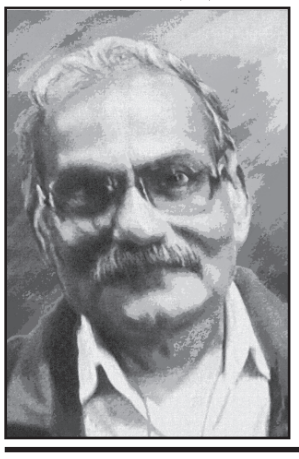

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে রবীন্দ্রনাথ ডায়গনস্টিক সেন্টারে কমরেড তরুণ আচার্যর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। কমরেড তরুণ আচার্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার প্রাক্তন সম্পাদক ও সভাপতি। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক।

১ নভেম্বর ১৯৪৭ মুর্শিদাবাদ জেলার মোরগ্রামে কমরেড তরুণ আচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত দুর্গাপদ আচার্য ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। মায়ের নাম প্রয়াত দয়াময়ী আচার্য। মোরগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়, জঙ্গীপুর হাইস্কুল, কৃষ্ণনাথ কলেজ ও মুর্শিদাবাদ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে শিক্ষালাভ করেন। পরে প্রাইভেটে ইংরেজিতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট হন। ১৯৬৮ সালে সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার পদে বাঁকুড়া জেলার সেচ দপ্তরে চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে বদলি হয়ে তিনি বহরমপুরে আসেন। ২০০৭ সালে ৩০ অক্টোবর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরি জীবনের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। বাঁকুড়া জেলায় সেচ দপ্তরে কংসাবতী প্রজেক্টের গোরাবাড়ি সাবডিভিশনে চাকরি করার সময় থেকেই সক্রিয়ভাবে সংগঠনের কাজ করতে শুরু করেন। প্রায় এক দশক তিনি বাঁকুড়া জেলার কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে আসীন ছিলেন।

মুর্শিদাবাদে বদলি হয়ে এসেও তিনি সংগঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং ধীরে ধীরে এই জেলাতেও সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পদে উন্নীত হন।

কমরেড তরুণ আচার্য ছিলেন মেধাবী, সুবক্তা, সদালাপী এবং পেশাগত ক্ষেত্রেও অত্যন্ত দক্ষতার অধিকারী। কর্মচারী মহলে এবং তার বাইরেও কমরেড তরুণ আচার্যের কবি হিসাবে পরিচিত ছিল। তাঁর বহু কবিতা পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র সংযোগে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শোষণমুক্তির সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা ছিল। আগামী ৭ মার্চ ২০১৫ বেলা ১২টায় বহরমপুরের রবীন্দ্রসদনে তাঁর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রানি রাসমণি এভিনিউতে ১২ই জুলাই কমিটির কর্মসূচী চলাকালীন তাঁর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছলে, প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। তাঁর পরিবারে স্ত্রী, দুই পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিরা রয়েছেন। □

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত নীতি এবং কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাব

দেশের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা, সাংগঠনিক অধিকার রক্ষা সহ অন্যান্য স্বার্থরক্ষার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বহনকারী সংগঠন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন এমন সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন ভারত সহ গোটা বিশ্ব প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত। এই অর্থনৈতিক সঙ্কট নয়া উদারবাদী বাজার অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ সঙ্কট ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধস নামিয়ে আনা আই এম এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, ডব্লু টি ও নির্দেশিত এই নয়া উদার অর্থনীতি ও শিল্পনীতি যা ভারতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে, তাকেই পাথেয় করেছিল বিগত ইউ পি এ সরকার। ভারতে এর প্রভাবে বহু শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, শেয়ার মার্কেটের সূচক সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে নীচে নেমে গেছে, ব্যাঙ্কের লিক্যুইডিটি ধরে রাখার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ত্রাণ তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা বিলানো হয়েছে। বেসরকারী বিমান পরিবহন সংস্থাগুলিকে বাঁচাতে সরকারী তহবিল থেকে বেল আউট প্যাকেজের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে শ্রমিক কর্মচারীরা বঞ্চিত হয়েছেন চূড়ান্ত রূপে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় এভাবে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে সার্বভৌম শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশের অবাধ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রও এই নীতির দ্বারা বিপন্ন। ডব্লু টি ও-র সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে গিয়ে দেশের শিল্প-কৃষি তথা আর্থিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হচ্ছে। বিশেষ করে ঔষধ শিল্প, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, পরিষেবা ক্ষেত্র এবং কৃষি ক্ষেত্র ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মুখীন, কেন্দ্রীয় সরকারের ডব্লু টি ও-র কাছে আত্মসমর্পণ এবং অগ্রণী ধনতান্ত্রিক দেশগুলির চাপের কাছে মাথা নোয়ানোর ফল হিসাবে।

বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ভোটাধিকার বৃদ্ধি, বীমাক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ, পেনশন ক্ষেত্রে ২৬ শতাংশ এবং রেল ব্যবস্থায় ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ প্রবেশের ব্যাপারে তারা উদ্যোগী হয়েছে। সামগ্রিক পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যয় কমানো হচ্ছে ব্যাপক হারে। স্বাস্থ্য, শিল্পসহ বিভিন্ন সরকারী ক্ষেত্র বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর দ্বারা বেকারী বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে এর দ্বারা সাধারণ মানুষের স্বার্থহানি ঘটছে। বিগত দু'বছর ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও কোথাও সামান্য কিছু নিয়োগ হচ্ছে তা ঠিকা বা চুক্তি প্রথার মাধ্যমে। করণিক, কারিগরী, সচিব পর্যায়, গ্রুপ-ডি কর্মচারী এবং শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া চলছে।

সাথে সাথেই মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি এবং অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির উত্থান ঘটছে। এদের সন্ত্রাসের বলি হচ্ছে নিরীহ জনগণ। ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা আজ বিপদের সম্মুখীন। কর্মচারীবর্গ ও শ্রমিকশ্রেণীকে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে, যেগুলি মালিকপক্ষ এবং সরকার কেড়ে নিতে চাইছে। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন এই সময়কালে কর্মচারী ও শিক্ষকদের উপর এই ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম করেছে। নয়া অর্থনীতি ও শিল্পনীতির বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়াও সংগঠন বেতন পুনর্বিন্যাস ও অন্যান্য আর্থিক বিষয় নিয়েও সংগ্রাম করেছে। এছাড়া সংবিধানের ৩১০ ও ৩১১(২) (খ) ও (গ) ধারা, কাশ্মীর সংবিধানের ১২৬(২) ধারা বাতিল, এসমা সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী আইনগুলি প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয় নিয়েও সংগ্রাম করেছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ ও ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ ধর্মঘটের অধিকার রক্ষা ও নয়া পেনশন আইন বাতিলের দাবিতে দুটি বড় ধর্মঘটে সংগঠন শামিল হলেও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও অনড় অবস্থানেই আছে।

কেন্দ্রীয় সরকার নির্লজ্জভাবে নয়া উদার মুক্ত বাজার অর্থনীতির পথে চলছে, যে নীতি এই মুহূর্তে ফের সঙ্কটাপন্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অবস্থানের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এই সম্মেলন। একই সাথে এই সম্মেলন এই ভয়ঙ্কর নীতির বিপদ এবং তার বিকল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজেরা সচেতন থেকে সবাইকে সচেতন করার জন্য কর্মচারীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের এই পঞ্চদশ রাজ্য সম্মেলন রাজ্য সরকারী কর্মচারী, আধা সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক সহ সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা ও দাবিদাওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে সংগ্রামে দায়বদ্ধ। অতএব এই সম্মেলন ৮০ লক্ষ রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, রাজ্যের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মচারী, বোর্ড ও কর্পোরেশনের কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে নিম্নলিখিত মৌলিক দাবিসমূহের সমর্থনে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য।

১। আইএমএফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, ডব্লু টিও নির্দেশিত বিশ্ব পুঁজিবাদের নয়া উদার মুক্ত বাজার নীতি এবং শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী শ্রমনীতি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে সরে আসতে হবে। এই নীতি ইতিমধ্যে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ভূমিকাকে রক্ষা করতে হবে, বিলগ্নীকরণের নামে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং বহুজাতিকদের অবাধ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মূল্য সীমা নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করতে এবং গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের

সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অতি দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

২। অভূতপূর্ব দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করতে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাসজনিত কারণে দেশে পেট্রোপণ্যের মূল্য হ্রাস করতে জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। বেসরকারী এবং প্রদানমূলক পেনশন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রক্রিয়া এবং বীমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের সীমা ২৬ শতাংশ থেকে ৪৯ শতাংশে বৃদ্ধি করার সরকারী সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। জিপিএফ ও ইপিএফ-এর সুদ পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে।

৪। বেরসরকারীকরণ, ছাঁটাই, চুক্তিপ্রথায় শিক্ষক এবং কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে এবং সরকারী দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারী ঠিকা ও চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত সমস্ত কর্মচারী ও শিক্ষকদের সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫। যেসমস্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হয়নি অথবা আংশিক কার্যকরী হয়েছে সেখানে উচ্চতর বেতনক্রম, মহার্ঘভাতা ও অন্যান্য ভাতা বকেয়াসহ কার্যকরী করতে হবে। রাজ্য সরকারগুলিকে কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেতন পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। বেতন পুনর্বিন্যাসজনিত কারণে রাজ্যগুলির বর্ধিত ব্যয়ভারের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে।

৬। সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকারসহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অবিলম্বে দিতে হবে। প্রয়োজনীয় সংসদীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে আইএলও কনভেনশনের ৮৭, ৯৮ এবং ১৫১ ধারা করতে হবে এবং ধর্মঘটের অধিকার প্রদান করতে হবে। ব্রিটিশ আমলে তৈরি সরকারী কর্মচারীদের জন্য কন্ডাক্ট রুলস বাতিল করতে হবে।

৭। সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, চরম বামপন্থী এবং সংকীর্ণতাবাদী হামলা, আঞ্চলিকতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িক বর্বরতা, যার বলি হচ্ছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিপুল সংখ্যক নিরীহ সাধারণ মানুষ, সেগুলিকে প্রতিহত করতে সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮। অতি বামশক্তি অধ্যুষিত পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা নিয়ে সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে জনস্বার্থবাহী ক্ষেত্রগুলিতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে এবং রাজ্যগুলিতে চালু কেন্দ্রীয় সরকারী স্পনসরড্ স্কীমগুলির বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। রাজ্য সরকারগুলিকে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে—মূলত যে অঞ্চলগুলিতে নানাধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই ধরনের আক্রান্ত রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা সহ অন্যান্য সহযোগিতা দিতে হবে।

৯। কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক পুনর্গঠন করে রাজ্যগুলিকে বেশি করে অর্থপ্রদান করে পর্যাপ্ত আর্থিক স্বয়ম্ভরতা দিতে হবে।

১০। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারকে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং শ্রম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সংগঠনকে আমন্ত্রণ করতে হবে।

গণকর্মসূচীর আহ্বান ঃ

(ক) এই সম্মেলন রাজ্য সরকারী কর্মচারী শিক্ষক এবং বোর্ড, কর্পোরেশন ও রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মচারীদের কাছে যে পুনরায় দেশব্যাপী জঙ্গী আন্দোলন, প্রয়োজনে ধর্মঘটে যাওয়ার প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এবং সম্মেলন আগামী দিনে সরকার সাড়া না দিলে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(খ) এই সম্মেলন কর্মচারী ও শিক্ষকদের ইউপিএ-২ সরকারের আমলে সংসদে পাশ হওয়া পিএফআরডিএ আইন বাতিল করার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনে নামার জন্য আবেদন করছে। এর জন্য প্রয়োজনে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের অন্যান্য অংশের শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে নিয়ে দেশব্যাপী ধর্মঘটে যাবার জন্য প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে।

(গ) বিশ্ব পুঁজিবাদের গভীর সঙ্কটের ফলশ্রুতিতে শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে জোরদার প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে এই সম্মেলন।

(ঘ) জাতীয় সংহতি রক্ষা ও সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতপাত, জাতিগত বিচ্ছিন্নতা এবং সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের জন্য এই সম্মেলন কর্মচারী ও শিক্ষকগণের কাছে সুতীব্র আবেদন জানাচ্ছে।

(ঙ) অনুগামীদের ঐক্যবদ্ধ শিক্ষিত এবং সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে, এই সম্মেলন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিকে নির্দেশ দিচ্ছে। এর ফলে সমস্ত অংশের নিপীড়িত জনগণকে আন্দোলনে সামিল করা যাবে। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃত্বে নিজস্ব দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার জন্য এই সম্মেলন রাজ্য কর্মচারী ও শিক্ষকদের প্রতি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নিকটতম সঙ্গী কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সংগঠনের সাথে সর্বস্তরে সমন্বয় তৈরি করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, যাতে আরো জোরালো ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা যায়।

(চ) কর্মচারী সমাজ ও সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যৌথ সংগ্রামে যাবার জন্য এই সম্মেলন কর্মচারীদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।

(ছ) স্থায়ীধরনের কোনো কাজে চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগ করা চলবে না এবং বর্তমানে এই প্রক্রিয়া চালু আছে এমন ক্ষেত্রে চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের সেই কারখানা / সংস্থার নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সমহারে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

(জ) ন্যূনতম মজুরী আইন সংশোধন করে সমস্ত অংশের শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী ১০,০০০ টাকা প্রতি মাসে করতে হবে।

(ঝ) বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রদান এবং প্রাপকের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের উর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করতে হবে এবং গ্র্যাচুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঞ) বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে অবাধে এফডিআই অনুপ্রবেশের নীতির সর্বাত্মক বিরোধিতা করতে হবে।

(ট) ট্রেড ইউনিয়নগুলির রেজিস্ট্রেশন ৪৫ দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে এবং অবিলম্বে আইএলও-র ৮৭ ও ৯৮ নম্বর কনভেনশনের স্বীকৃতি দিতে হবে।

আসুন আমরা জয়ের পথে এগিয়ে চলি। □

ভাষান্তর ঃ মানস কুমার বড়ুয়া

ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সার্ভিসেসের ১২তম কংগ্রেসের গৃহীত আগামী দিনে করণীয় কাজ ও দাবিসমূহ

১। বেসরকারীকরণের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে লাভের কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজন অনুসারে আধুনিক, দক্ষ, মেধাসম্পন্ন বিশ্বজনীন ও অবৈতনিক লোকসেবার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

২। সরকারী প্রশাসনের কর্মচারীদের অধিকার যে সব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বিনষ্টকারী সকল আইন বাতিল করতে হবে।

৩। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে সরকারী প্রশাসনে কর্মচারীদের বেতন ও কর্মক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নতির মধ্য দিয়ে তাদের জীবন মানের উন্নতি করতে হবে।

৪। নিরাপত্তাহীন কাজের চুক্তি রদ এবং চাকুরির স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে যা পুঁজিবাদী সরকারের অধীনে কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারীদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে।

৫। সর্বক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা রক্ষা করার অধিকার এবং কাজের চুক্তি বিষয়ে সামগ্রিক দর-কষাকষির অধিকার প্রদান করতে হবে।

৬। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের স্বার্থে সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের জন্য সামাজিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

৭। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে শ্রমজীবী জনসাধারণের অধিকার বিনষ্টকারী সমস্ত নব্য উদার ও ব্যায় সঙ্কোচ নীতি বহন করতে হবে।

৮। আন্তর্জাতিক সংহতি ও শান্তি বজায় রাখতে যুদ্ধ, সামরিক আগ্রাসন, অন্য রাজ্যকে অবরুদ্ধ করা যা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এই সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। যার ফলে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যাবে এবং প্রত্যেক দেশের মানুষ নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারবে। □

(বিস্তারিত সংবাদ অষ্টম পৃষ্ঠায়)

ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্‌থ ফর অল এমপ্লয়ীজ অ্যান্ড পেনশনারস ক্যাশলেস মেডিকেল ট্রিটমেন্ট স্কীম '২০১৪

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নিদারুণ অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং অধিকারগত লড়াই আন্দোলনের মঞ্চ হিসেবেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জন্ম। সমিতি তার জন্মলগ্ন থেকেই সেই গুরুদায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছে।

দেশব্যাপী উদার অর্থনীতির প্রয়োগের ফলে চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা যখন কর্মচারীদের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন ''স্বাস্থ্যের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার'' এই স্লোগানকে সামনে রেখেই রাষ্ট্রের নীতির তীব্র বিরোধিতার পাশাপাশি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থে নীতি প্রণয়নের জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও লাগাতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসাবেই বামফ্রন্ট সরকার তার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ''W.B. Health Scheme 2008'' এই নামে কর্মচারীদের স্বার্থে যে আদেশনামা প্রকাশ করে, তা যেমন ঐতিহাসিক, পাশাপাশি সারা ভারতবর্ষে সমগ্র রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কাছে এটা অভূতপূর্ব বিষয় হিসাবেই গণ্য হয়। উক্ত আদেশনামার দৃষ্টান্তমূলক বিষয় হচ্ছে যে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচের ক্ষেত্রে উর্ধ্বসীমার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

বিস্ময়ের সাথে কর্মচারী সমাজ লক্ষ্য করলো যে কর্মচারীদের ৪২% মহার্ঘভাতা প্রদান করার জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পত্র এবং কর্মচারীদের উক্ত ন্যায্য দাবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ২৭ ফেব্রুয়ারি উক্ত প্রকল্পকে ঘোষণা করেন, তাও আংশিক এবং তার প্রায় ছয় মাস পরে ২৮ আগস্ট ২০১৪ নোটিফিকেশন করেন, সংগঠনের সাথে কোনো আলোচনা ছাড়াই।

ফলস্বরূপ এই স্কীমে প্রচুর অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজ্য সরকারী পেনশনার/পারিবারিক পেনশনারদের জন্য এই প্রকল্পের নাম ''West Bengal Health for all Employees Pensioners Cashless Medical Treatment Scheme 2014'' Health Scheme 2014- Cashless (আংশিক) কে কেন্দ্র করে তিনটি সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে।

1. No 4476-F (MED) 28th Aug. 2014.

2. No 4656-F (MED) dated 5-9-2014

3. No 4803-F (MED) dated 12-9-2014

১নং ২নং আদেশনামায় নতুন স্কীমে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত এবং ৩নং আদেশনামায় পেমেন্ট সংক্রান্ত বিষয় বলা আছে।

১। নতুন স্কীম চালু হচ্ছে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে।

২। এই স্কীমে ঢোকার সুযোগ থাকছে ৩১ মার্চ ২০১৫ অবধি।

৩। এই স্কীমে এক লক্ষ টাকা অবধি ক্যাশলেস করা হয়েছে।

এক লক্ষ টাকার বেশি খরচা হলে অতিরিক্ত টাকা নিজেকেই পেমেন্ট করতে হবে। কর্মরতরা এক লক্ষ টাকার অতিরিক্ত অর্থের উপর ৮০% অগ্রিম পাবেন।

৪। বর্তমান কার্ড হোল্ডারদের এনরোলমেন্টের জন্য অর্থ দপ্তরের হেলথ স্কীম Portal এর website http://wbfin.nic.in দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে।

৫। GPF A/c No. log in ID এবং 'Date of Birth' Password হিসাবে ব্যবহার করে Registration করতে হবে। Pensioner এবং Family Pensioner দের ক্ষেত্রে P.P.O. No. Log in.ID হিসাবে ব্যবহার হবে। সকল ক্ষেত্রেই পারিবারিক সদস্য হিসাবে যাদের নাম পুরানো কার্ডে ছিল, সেইসব নাম নতুন করে ঢোকাতে হবে।

৬। Registration করার পরে তিন কপি দরখাস্তের Print বার করে তিন কপি stamp size photo সহ অতিরিক্ত তিন কপি photo ডি.ডি.ও-র কাছে জমা দিতে হবে। যা ডি.ডি.ও Enrolment Certificate এর নির্দিষ্ট স্থানে লাগাবেন।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা আপনার সরকারী হাসপাতালে কোনো রাজ্য সরকারী কর্মচারী ভর্তি হলে, উনি যদি Cashless Health Card এর অধিকারী হন, তাহলে আপনি সেই কর্মচারীকে এক লক্ষ টাকার Cashless এর সুযোগ দিচ্ছেন তো?

উত্তর ঃ না, না, এই রূপ কোনো আদেশনামা আমাদের কাছে নেই তো।

প্রশ্ন ঃ কেন, বর্তমান রাজ্য সরকার তো 4476-F(MED) 28th Aug. 2014, No 4656-F(MED) dt. 5.9.2014 এবং 4803-F(MED) dt. 12.9.2014 তে তো 15th Sept. 2014 থেকে এই স্কীম চালু করে দিয়েছে।

উত্তর ঃ না, না, আমাকে ভুল বুঝবেন না প্লীজ। সরকার আদেশনামা প্রকাশ করলেও, আমাদের কাছে এর কার্যকরী করার কোনো নির্দেশ নেই। স্বাভাবিকভাবেই আমরা একে কার্যকরী করতে অপারগ।

তারিখ ৯/২/২০১৫ স্থান ঃ কলকাতার নামী হাসপাতাল; প্রশ্নকর্তা ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং উত্তরদাতা ঃ নামী সরকারী হাসপাতালের সর্বোচ্চ প্রশাসক।

দেবাশিস মিত্র

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

৭। কর্মচারী বা Pensioner দের দেওয়া দরখাস্ত Health Scheme Module অনুযায়ী D.D.O কে পরীক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে D.D.O তার code নম্বরকে log in I.D হিসাবে ব্যবহার করবেন।

৮। D.D.O বা PSA এরপর Online enrolment certificate Beneficiarywise print করে তার সই ও photo attestation সহ কর্মচারীদের প্রদান করবেন। (PSA- Pension Sanctioning Authority)। এই Enrolment Certificate Health Card হিসাবে ব্যবহৃত হবে যতদিন না সরকারী অনুমোদিত Agent দ্বারা Formal Health Card প্রদান করা হচ্ছে।

৯। কোনো কর্মচারী যদি বদলি হন, তাহলে বর্তমান D.D.O নতুন দপ্তরের D.D.O Code ব্যবহার করে উক্ত Entolment Certificate পাঠিয়ে দেবেন, একইভাবে যদি এমন হয় যে Pensioner বা Family Pensioner কেউ বর্তমানে নিজস্ব PSA ছাড়া অন্য অফিস থেকে এই সুযোগ পাচ্ছেন Memo No. 10795F(MED) Dt 22.11.2010. Memo No/ 8246-F(MED) dt 28.9.2012 সেক্ষেত্রে PSA তাঁর নতুন D.D.O Code দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

১০। কোনো কর্মচারী তালিকাভুক্ত বেসরকারী হাসপাতালে যদি ভর্তি হতে যান তখন তাকে উক্ত কেন্দ্রে ওই Enrolment Certificate দেখাতে হবে। যার ভিত্তিতে তিনি সেখানে ভর্তি হতে পারবেন। যখন তিনি উক্ত জায়গা থেকে ছাড়া পাবেন তখন সেই চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচের হিসাবের বিশেষ কপি উক্ত চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে তাঁকে দেওয়া হবে।

১১। কলকাতায় অবস্থিত Health Care Organisation Cashless সংক্রান্ত respective Department গুলোতে পাঠাবে Re-imburse করার জন্য।

১২। জেলায় অবস্থিত H.C.O. তাদের বিলের কপি District Magistrate-এর Medical cell এর কাছে পাঠাবে। উক্ত Cell সেই Payment এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩। প্রত্যেক জেলার Dist. Magistrate কে Medical Cell গঠন করতে হবে।

১৪। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অবস্থিত চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। নতুন আদেশনামার মধ্যে দিয়ে কর্মচারীদের যে সব অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে।

১। এই Notification এর সঙ্গে সংযোজনী হিসাবে যে সমস্ত empanelled H.C.O (Health Care organisation) এর নাম দেওয়া হয়েছে তাদের ৮৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় সবকটিই এর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে। ২ জানুয়ারি ১৫ অর্থদপ্তরের Website-এ যে ১০টি H.C.O. নাম Provisional তালিকায় নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে তারে মধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানও এই Cashless এর সুযোগ নেই বলে চিকিৎসাপ্রার্থী কর্মচারী এবং Pensioner-দের প্রত্যাখ্যান করেছে।

২। এই Cashless Health Scheme এর সুযোগ কেবলমাত্র indoor treatment এর জন্য প্রদান করা হবে। নির্ধারিত ১০টি ক্ষেত্রে OPD বা Day Care Treatment-এর যে সুবিধা ছিল তার কোনো উল্লেখ নেই।

৩। ১ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হলে বর্ধিত খরচ কিভাবে ফেরত পাওয়া যাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ থাকার দরকার ছিল।

৪। যেসব H.C.O Cashless এর order প্রত্যাখ্যান করছে তাদের কাছে কেউ নিজ ব্যায়ে চিকিৎসিত হলে Cashless registration এর পরে তার Re-imbursement এর পদ্ধতি কি হবে এ নিয়ে কোনো উল্লেখ নেই।

৫। বিভিন্ন দপ্তরে প্রযুক্তিগত অসুবিধার কারণে যে সব পুরানো Scheme এর সুবিধাভোগীরা নতুন এই Scheme এর সুযোগ 31st March 2015 মধ্যে নিতে পারবেন না তাদের অবস্থান কি হবে তার উল্লেখ নেই।

৬। দূরবর্তীস্থানে চিকিৎসিত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকটবর্তী বসবাস এলাকায় বা সংশ্লিষ্ট অফিসের সদর দপ্তরে চিকিৎসার হিসাব পেশ করা এবং re-imburse করার যে সুযোগ পূর্ববর্তী Health Scheme 2008

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

ক্যাশলেস হেলথ স্কীম, ২০১৪ প্রসঙ্গে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পত্র

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

ক্রমিক নং : কো-অর্ডি-১৯ / ১৫
তারিখ : ২৭.০২.২০১৪

বিষয় ঃ ক্যাশলেস হেলথ স্কীম, ২০১৪ প্রসঙ্গে (অর্থ দপ্তরের নোটিফিকেশন নং ৪৬৫৬-এফ (এম ই ডি) তাং ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

মহাশয়া,

আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আশা করি, আপনার নিরতিশয় ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি বিষয়টির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন এবং উদ্ভূত সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি ঘটবে।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরিষেবা সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ফর অল এমপ্লয়িজ অ্যান্ড পেনশনার্স ক্যাশলেস মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট স্কীম, ২০১৪' [নোটিফিকেশন নং ৪৪৭৬-এফ (এম ই ডি) তাং ২৮ আগস্ট, ১৪, নং ৪৬৫৬-এফ (এম ই ডি) তাং ৫ সেপ্টে, ১৪ এবং মেমোরেন্ডাম নং ৪৮০৩-এফ (এম ই ডি) তাং ১২ সেপ্টে, ১৪] প্রকাশ করেছেন এবং প্রচলিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীম, ২০০৮-র অতিরিক্ত হিসাবে এই ক্যাশলেস হেলথ স্কীম, ২০১৪ এর সুযোগ বিস্তৃত করা হল বলে সরকারী নির্দেশগুলিতে জানানো হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত স্কীমটি 'ক্যাশলেস' বলা হলেও মাত্র ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই সুযোগ ক্যাশলেস স্কীমে পাওয়া যাবে যা স্কীমটির নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অথচ এর ফলে জনমানসে সরকারী কর্মচারীরা চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাচ্ছেন বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

এছাড়া ক্যাশলেস স্কীম, ২০১৪-র সম্প্রসারিত সুযোগ নিতে গিয়ে কর্মচারীরা বর্তমানে নিম্নলিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন;

প্রথমত ঃ এই নোটিফিকেশনের সঙ্গে সংযোজনী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ এবং জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের যে সকল অন্তর্ভুক্ত হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন (empanelled Health Care Organigation)-এর নাম দেওয়া হয়েছে (জেলাগুলিসহ) তাদের ৮৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিংহভাগ হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন এই সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন, শুধু তাই নয় গত ২ জানু., ১৫ এবং ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৫ অর্থ দপ্তরের যে ওয়েব সাইটে ১৫টি হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশনের নাম প্রভিশনাল তালিকায় নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে তাদের মধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানও এই ক্যাশলেশ-র সুযোগ নেই বলে চিকিৎসাপ্রার্থী সরকারী কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের প্রত্যাখ্যান করেছেন;

দ্বিতীয়ত ঃ এই ক্যাশলেশ হেলথ স্কীম এর সুযোগ কেবলমাত্র ইনডোর চিকিৎসার জন্য প্রদান করা হবে, কিন্তু নির্ধারিত ১০টি ক্ষেত্রে ও পি ডি / বা আপৎকালীন অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য সম্প্রসারিত হয়নি;

তৃতীয়ত ঃ ক্যাশলেস হেলথ স্কীম অনুযায়ী ১ লক্ষ টাকার বেশি প্যাকেজ হলে বাড়তি টাকা সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মচারী সংশ্লিষ্ট হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশনকে প্রদান করবেন বলে বলা হলেও সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মচারীর ব্যয়পূরণ (re-imbursement) দাবি কিভাবে নিষ্পত্তি ঘটবে তা সুস্পষ্টবাবে ঐ আদেশনামায় বলা হয়নি;

চতুর্থত ঃ ১৫ সেপ্টে, ১৪ পরবর্তীকালে যে সকল কর্মচারী কেবলমাত্র ক্যাশলেস স্কীমে নাম নথিভুক্ত করেছেন তাদের ১ লক্ষ টাকার অধিক চিকিৎসা ব্যয়পূরণ বিল কিভাবে নিষ্পত্তি হবে বা উল্লিখিত হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশনে ১ লক্ষ টাকার নীচে চিকিৎসার সুযোগ নিলে যাঁদের সিংহভাগ এই সুযোগ দিচ্ছেন না বা নেই বলে জানিয়েছেন কিভাবে সেই বিলের নিষ্পত্তি হবে তা ঐ আদেশনামায় ব্যাখ্যা করা হয়নি;

পঞ্চমত ঃ উল্লিখিত হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশনে ক্যাশলেস স্কীমের নির্দেশিকা অনুযায়ী চিকিৎসার সুযোগ নগদে নিলে নতুন স্কীমে রেজিস্ট্রেশন এর পর) তার চিকিৎসা ব্যয়পূরণ বিলই বা কীভাবে নিষ্পত্তি হবে তাও বলা হয়নি;

ষষ্ঠত ঃ 'ও বে হেলথ ফর অল এমপ্লয়িজ অ্যান্ড পেনশনার্স ক্যাশলেস মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট স্কীম, ২০১৪' কেবলমাত্র অনলাইনে নথিভুক্তকরণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে অফলাইনে নথিভুক্তিকরণের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। পাশাপাশি, সদ্য চাকরি পাওয়া কর্মচারী যারা জি.পি.এফ. অ্যাকাউন্ট নম্বর পান নি তাঁদের এই স্কীমে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

সপ্তমত ঃ ৩১ মার্চ, ২০১৫-র পর পুরনো স্কীমের সুবিধাভোগীরা (beneficiaries of WB Health Scheme '08) যাঁরা এই নতুন স্কীমের সুযোগ নিতে পারবেন না (দূরবর্তী স্থানে থাকা, প্রযুক্তিগত সুবিধার অভাব ও অন্যান্য কারণে) তাদের অবস্থান কী হবে (status) তাও উল্লেখ করা হয়নি;

অষ্টমত ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-র পরে যাঁরা নতুন করে (fresher) এই ক্যাশলেস স্কীমে যুক্ত হবেন, সেই সকল দূরবর্তীস্থানে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী নিকটবর্তী বসবাসের এলাকায় বা সংশ্লিষ্ট অফিসের (যে অফিস থেকে অবসর নিয়েছেন) সদর দপ্তরে চিকিৎসার ব্যয়পূরণ বিল (Medical Re-imbursement bill) পেশ করা ও ব্যয়িত খরচ পাওয়ার যে সুযোগ (enrolled elsewhere but allowed to furnish his claim in any nearby District Office or Head Quarters Office) পূর্ববর্তী হেলথ স্কীমে (W B Health Scheme '08) পেতেন, বর্তমান আদেশনামায় তাঁদের অবস্থান কী হবে তা জানানো হয়নি;

নবমত ঃ নতুন স্কীমে (Cashless Shceme, 2014) সরকারী হাসপাতাল, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতাল; স্বায়ত্তশাসিত যেমন পৌরসভা পরিচালিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্যাশলেস সুযোগ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। শুধু তাই নয় উক্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চিকিৎসার সুযোগ নিলে কর্মচারী, পেনশনার এবং সুবিধাভোগীদের ব্যয়পূরণ বিল কীভাবে মেটানো হবে তাও ব্যাখ্যাত হয়নি।

সর্বোপরি পূর্ববর্তী ২০০৮ সালের স্কীমটি (W B Health Scheme '08) ঐচ্ছিক থাকলেও (optional)। বর্তমান স্কীমটিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (madatory) যা কোনা স্কীমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বস্তুত ক্যাশালস স্কীমের আদেশনামাগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারীভাবে ক্যাশলেসভুক্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্যাশলেস এর সুযোগ না পাওয়ায় কর্মচারী / পেনশনার / ফ্যামিলি পেনশনাররা নিদারুণ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছেন এবং প্রভূত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

এমতাবস্থায়, সমগ্র বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে এবং 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ফর অল এমপ্লয়িজ অ্যান্ড পেনশনার্স ক্যাশলেস মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট স্কীম, ২০১৪'র অসঙ্গতি দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং সকল কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রকৃত অর্থে ক্যাশলেস হেলথ স্কীমের সুযোগ চালু করার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে
ভবদীয়
(মনোজকান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

প্রথম মহাযুদ্ধ : শতবর্ষে ফিরে দেখা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

প্রথম মহাযুদ্ধের চরিত্র বর্ণনা করে কমরেড লেনিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' গ্রন্থের ফরাসি ও জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, ... "উভয় পক্ষের দিক থেকেই ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী (অর্থাৎ পররাজ্যগ্রাসী, দস্যুতামূলক, লুণ্ঠনলোলুপ) যুদ্ধ, দুনিয়াকে ভাগাভাগি করবার জন্য, উপনিবেশ আর মহাজনী পুঁজির 'প্রভাবাধীন অঞ্চল' প্রভৃতিকে নতুন করে বাঁটোয়ারা করবার জন্যই এই যুদ্ধ।" কমরেড লেনিনের এই মূল্যায়নকে সামনে রেখেই শতবর্ষে প্রথম মহাযুদ্ধকে পর্যালোচনা করতে হবে। বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী এক শতাব্দী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নতুন চেহারার বিশ্লেষণ জরুরি। বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধকে যারা 'যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাদের মূল্যায়ন ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের পর আড়াই দশকের মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেমে নেই, প্রতিদিনই বিশ্বের কোনো না কোনো প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র অভিযান সংগঠিত হচ্ছে। তাই দুনিয়া থেকে পুঁজির শাসন-শোষণের অবসানের মধ্য দিয়েই যুদ্ধ পরিস্থিতির চিরতরে অবসান সম্ভব।

।। এক ।।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে অর্থাৎ ১৮৭১ সাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইউরোপের বুকে কোনো বড় ধরনের যুদ্ধ ঘটেনি। ১৯১২-১৩ সালে বলকানে দু-একটি ছোটোখাটো যুদ্ধ হলেও বৃহৎ শক্তিগুলি এই যুদ্ধে যুক্ত হয়নি।

সাধারণভাবে ১৯০৪ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এক দশকের ইতিহাসকে ঐতিহাসিকরা 'সশস্ত্র শান্তির যুগ' বা 'এজ অব আর্মড পীস' বলে চিহ্নিত করে থাকেন। এই সময়কার মূল বৈশিষ্ট্য ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলির দুই প্রধান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়া। জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও ইতালি ত্রিশক্তি চুক্তিজোট বা ট্রিপল অ্যালায়েন্স গঠন করে। এই জোটে পরবর্তীকালে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া যুক্ত হয়। অপরদিকে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ব্রিটেন এই তিন শক্তি অপর একটি ত্রিশক্তি জোট গঠন করে।

এই দুই জোট পরস্পর বিরোধী হলেও এর লক্ষ্য ছিল ইউরোপে শক্তিসাম্য স্থাপন করে শান্তি বজায় রাখা। প্রথমেই পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য গঠিত হয়নি এই জোট। জার্মানির নৌ শক্তি এবং সেনা শক্তি এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে এর সাথে সমতা রক্ষার প্রয়োজনে রাশিয়া ও ফ্রান্স জোটবদ্ধ হয় এবং পরে ব্রিটেন এখানে যোগ দেয়। কিন্তু প্রথমদিকে এই জোট গড়ার যে লক্ষ্য ছিল, বাস্তবে তা সফল হয়নি। এই দুই জোট গঠনের যে লক্ষ্য অর্থাৎ শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠা, বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। বিপ্রতীপে যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শক্তিগুলি অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় মত্ত হয় এবং গোপন কূটনৈতিক আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে উদ্যোগী হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বৈঠক ডেকে আলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করা সম্ভব ছিল, তা করা হয়নি। পরন্তু বিভেদের নিষ্পত্তি অস্ত্রের মাধ্যমেই সম্পন্ন করার চিন্তা প্রাধান্য পায়। এইভাবেই শক্তিসাম্যের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে শক্তির দম্ভের দ্বারা শান্তিকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়।

এই পটভূমিকায় এমন কয়েকটি বিরোধ স্পষ্ট হয় যার পরিণতিতে ইউরোপ অবশ্যম্ভাবী বিশ্বযুদ্ধের লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। প্রথমত, ব্রিটেন ও জার্মানির ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এরফলে ব্রিটেনের আশঙ্কা হয় যে, কাইজার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি দখল করতে চায়, তুর্কী সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে ব্রিটিশ ভারতীয় উপনিবেশের সঙ্গে ব্রিটেনের যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করতে চায়। দ্বিতীয়ত, ফ্রাঙ্কো-ইতালির বিরোধ। ফ্রান্সের উত্তর আফ্রিকা সাম্রাজ্যে তার ন্যায্য হক আছে বলে ইতালি মনে করত। এর মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তৃতীয়ত, ইঙ্গ-জার্মান নৌ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জার্মান নৌ-শক্তি বৃদ্ধি পেলে উত্তর সাগর ও ইংলিশ

চ্যানেলে নিজেদের উপকূল আক্রান্ত হতে পারে বলে ব্রিটেন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এর মধ্য দিয়ে উভয় দেশের মধ্যে শুরু হয়ে যায় নৌ প্রতিযোগিতা। চতুর্থত, অস্ট্রো-সার্ব বিরোধ। বার্লিন সন্ধি ভেঙে বসনিয়া ও হার্জগোবিনা অধিকার করায় সার্বিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এই দুটি অঞ্চলে সার্বজাতির মানুষদের বসবাস ছিল। এর মধ্য দিয়ে অস্ট্রো-সার্ব বিরোধ তীব্র হয়। পঞ্চমত, একে কেন্দ্র করে বলকান অঞ্চলে যুদ্ধ উন্মাদনা দেখা দেয়।

পূর্বোক্ত কারণগুলি ছাড়াও জাতীয়তাবাদী সংঘাত এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করে। এই সংঘাত ছিল ক্রূর, নিষ্ঠুর ও উন্নত চরিত্রের। কোন কোন ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদ ছিল সংকীর্ণ অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার উদগ্র প্রকাশ। এর পাশাপাশি কোন কোন ক্ষেত্রে তা ছিল অতৃপ্ত, অসম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদের ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি। এই জাতীয়তাবাদী বিরোধগুলি ইউরোপকে অগ্নিকুন্ডে পরিণত করে। যেকোন একটি ঘটনা একটি যুদ্ধ বাধাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ১৮৭১ সালে জার্মানি খনিজদ্রব্য সমৃদ্ধ ফরাসী অঞ্চল আলসাস ও লোরেন দখল করায় ফ্রান্স ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ত্রিশক্তি আঁতাত গঠিত হলে ফ্রান্স পায়ের তলায় কূটনৈতিক জমিন পেয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে আক্রমণের তোড়জোড় চালায়। দ্বিতীয়ত, জার্মান জাতির অহমিকাপূর্ণ জাতীয়তাবাদ ছিল অত্যন্ত নগ্ন, ক্রূর ও আত্মম্ভরী। জার্মানরা নিজেদের টিউটনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান বলে গণ্য করত। অবিশ্বাস্যভাবে তিন যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিসমার্কের ন্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম দক্ষ রাজনীতিবিদের সাহায্যে এবং অসাধারণ দ্রুত গতিতে শিল্পসমৃদ্ধ এক দেশে জার্মানি নিজেদেরকে পরিণত করে। এছাড়া ছিল বিশাল ও শক্তিশালী সাহসী স্থলবাহিনী, যা ছিল জার্মান দম্ভের প্রধান উৎস। বিশ্ব রাজনীতিতে একমাত্র জার্মান রাজনীতির স্বার্থ ব্যতীত আর কারোর স্বার্থ দেখতে জার্মানরা প্রস্তুত ছিল না। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন এই উগ্র জাতীয়তাবাদী, প্যান জার্মানবাদী মানসিকতার সন্তান। তৃতীয়ত, এর সাথে যুক্ত হয় বলকান আহত জঙ্গী জাতীয়তাবাদের সমস্যা। বিশেষত উগ্র সার্ব বা দক্ষিণ স্লাভ জাতীয়তাবাদীরা বুলগেরিয়াকে হঠিয়ে ম্যাসিডোনিয়া ও থ্রাস্ট দখল এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে বসনিয়া ও হার্জগোবিনা দখল করতে বদ্ধপরিকর ছিল। চতুর্থত, ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বগুলি ১৯১৪-এর পূর্বে নিষ্পত্তি হলেও এর মধ্য দিয়ে তিক্ততার অবসান ঘটেনি। এই জটিল জাতীয়তাবাদী বিরোধগুলি, ইউরোপ দুই শিবিরে বিভক্ত হলে, অনুকূল পরিবেশ পেয়ে নতুনভাবে মাথা চাড়া দেয়। এর মধ্য দিয়ে তৈরি হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমি।

এই সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ ও তাঁর পত্নী সারাজেভো নামক স্থানে এক উগ্রপন্থী বসনিয়ান ছাত্রের দ্বারা নিহত হন। অস্ট্রিয়ার ধারণা এই হত্যাকান্ডের পিছনে সার্বিয়া সরকারের ষড়যন্ত্র ছিল। ক্রুদ্ধ অস্ট্রিয়া সরকার এজন্য সার্বিয়ার নিকট চরমপত্র প্রেরণ করে এবং দুইদিনের মধ্যে দাবিগুলি পূরণের জন্য চাপ দেয়। অস্ট্রিয়া সরকারের এই চরমপত্র বারুদের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করে। সার্বিয়া চরমপত্রের কয়েকটি শর্ত মেনে অবশিষ্টগুলি অগ্রাহ্য করলে, সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ ঘোষণা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধে বিপুল সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও জার্মানির পরাজয় ঘটে। এর প্রধান দুটি কারণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। জার্মানির সামরিক ইতিহাসবিদদের মতে জার্মানির যে লোকবল ও অস্ত্রবল ছিল, তা দিয়ে স্বল্পকালীন যুদ্ধ জয় সম্ভব ছিল, কিন্তু জার্মানির পক্ষে দীর্ঘকালীন যুদ্ধে জয় অর্জন অসম্ভব ছিল। বিপরীত পক্ষে ত্রিশক্তি আঁতাতের সম্পদ ও শক্তি এমন ছিল যে, তারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভার বহন করতে পারত। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের উপনিবেশগুলি থেকে অর্থ ও লোকবল সংগ্রহ করে। কিন্তু জার্মানির পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভার গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। মিত্র পক্ষ এই কারণে যুদ্ধটিকে দীর্ঘায়িত করে। ফলে জার্মানির শক্তি শেষ হয়ে যায়। পরাজয়ের অপর একটি কারণ ছিল ১৯১৭ সাল পর্যন্ত জার্মানিকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই রণাঙ্গনে সৈন্য সমাবেশ করে দুটি সীমান্তে যুদ্ধ করতে হয়। এরফলে কোনো একটি সীমান্তে জার্মানি পুরো শক্তি সন্নিবেশিত করতে পারেনি। তাছাড়া কূটনৈতিক দিক থেকে ত্রিশক্তি আঁতাতে জার্মানি ভাঙন ধরাতে পারেনি। ১৯১৭ সালে রাশিয়া যুদ্ধত্যাগ করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই স্থান পূরণ করে। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৭ সালে পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে কিন্তু ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র শক্তির পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

।। দুই ।।

প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পূর্বের সমস্ত যুদ্ধের ধ্বংসকাণ্ডকে ছাড়িয়ে যায়। প্রায় ২৬ লক্ষ সেনা এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং আহত মানুষের সংখ্যা ৭০ লক্ষ। প্রচুর ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানি এই যুদ্ধে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধজনিত মহামারী, দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতির কারণে বহু প্রাণহানি হয়। এই যুদ্ধে জার্মানি এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, সেখানে কার্যত দুর্ভিক্ষের ন্যায় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ ফেরৎ বিপুল সংখ্যক জার্মান সেনা বেকার হয়ে পড়ে। মন্দাজনিত কারণে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে পড়ায় বেকারী বৃদ্ধি পায়। জার্মান মুদ্রা মার্কের অবমূল্যায়ন ঘটায় জার্মান অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ে।

ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এই যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তাদেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এরফলে মিত্র শক্তি তাদের পূর্বকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যে ইঙ্গ-ফরাসি শক্তি একসময় বিশ্বের প্রধান দুই শক্তি ছিল, যুদ্ধের পর তার অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়। এই শূন্যস্থান পূরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের ১৪ দফা নির্দেশ, ১৯১৯ সালে প্যারিস শান্তি সম্মেলন এবং ভার্সাই চুক্তি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে ৩২টি দেশ অংশ নেয়। মিত্রশক্তি দেশগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও জাপান। এরাই ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয়ী। এর মধ্যে প্রধান ভূমিকা প্রতিপালন করেন ফরাসি মন্ত্রী ক্লেমাঁসু, ব্রিটেনের মন্ত্রী লয়েড জর্জ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন।

উইলসনের ১৪ দফা, প্যারিস শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি ভার্সাই চুক্তির বিভিন্ন শর্তগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা না করেই বলা যায় যে, এর প্রেক্ষাপটে ছিল মিত্র শক্তি কর্তৃক জার্মানিকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু করা। জার্মানির প্রতি ন্যায়বিচার করার পরিবর্তে জার্মানিকে দুর্বল করে রাখার লক্ষ্যটিকে গ্রহণ করা হয়। এ কারণে জার্মানির কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ অধিগ্রহণ করে, জার্মানিকে ক্ষমতাহীন করা হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিধ্বস্ত জার্মান জাতি এই ভার্সাই চুক্তিটিকে অন্যায় বলে মনে করে। এর পরিণতিতে তারা ভার্সাই সন্ধি চুক্তি ভেঙে ফেলে। এর মধ্য দিয়ে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরপরই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই বিশ্বযুদ্ধের একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং অন্যদিকে ছিল জার্মানি, ইতালি এবং জাপান। জার্মানি ১৯৩৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করলে জার্মানির বিরুদ্ধে ইঙ্গো-ফরাসি শক্তি ৩ সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। এই যুদ্ধ ছয় বছর স্থায়ী হয় এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৬ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ চীনে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়। দূরপ্রাচ্যে উত্তর কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ১৯৫৯ সালে কিউবা বিপ্লব জয়ী হয়। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি ভিয়েতনামে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম জয়ী হয়। এসবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠে। এর পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনে শৃঙ্খলিত এশিয়া, আফ্রিকার শতাধিক দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম জয়ী হয়। সদ্য স্বাধীন এই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিয়ে ভারত, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, যুগোশ্লাভিয়ার উদ্যোগে তৈরি হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে উদ্ভূত এই নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। এই সময়কালে নতুন ধরনের এক আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি সৃষ্টি হয় যা চরিত্রগত দিক থেকে ছিল বহুজাতিক, বিশ্বের সর্বত্র অবাধ গতির অধিকারী এবং উৎপাদন-ধর্মী ফাটকা বাজারে বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র। কমরেড লেনিনের সংজ্ঞায়িত লগ্নী পুঁজির থেকে চরিত্রগত দিক থেকে এই আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির পার্থক্য থাকায় আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। যদিও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়, বাণিজ্যিক যুদ্ধ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এই দ্বন্দ্ব রয়েছে।

।। তিন ।।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নর অবলুপ্তি এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীশক্তিসমূহের ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে আবর্তিত হয়েছে। এটা ঠিক যে নতুন করে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশু সম্ভাবনা হয়তো নেই; কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রয়েছে তিনটি ঘোষিত লক্ষ্য। প্রথমত, অবশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিলোপ সাধন, দ্বিতীয়ত, তৃতীয় দুনিয়ার জাতীয়তাবাদ যা উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বাস্তবায়িত হয়েছিল, তাকে হয় পরাস্ত করা অথবা দুর্বল করা এবং তৃতীয়ত, বিশ্বব্যাপী স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজের সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখা। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে প্রকাশিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ডিফেন্স প্ল্যানিং গাইডেন্স'-এর লক্ষণ দেখা যায়। এখানে লক্ষ্য ঘোষণা করে বলা হয় যে, "আগের সোভিয়েত ইউনিয়নের মত কোনো নতুন বিপদ যাতে তৈরি না হয়, তার জন্য নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে গড়ে না ওঠে তা দেখাই প্রথম লক্ষ্য। বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠার মতো সম্পদ আছে এমন কোনো শক্তিকে কোনো অঞ্চলে আধিপত্য করতে দেওয়া যাবে না।"

এর সূত্র ধরে ২০০০ সালে 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স' পত্রিকায় প্রাক্তন মার্কিন বিদেশ সচিব কন্ডোলিজা রাইস লিখেছিলেন, "চীন হল গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থবাহী দেশ, চীন এই মুহূর্তে এশিয়ায় আমেরিকার মতন ভূমিকা পালন করছে।" তাই চীনকে মোকাবিলা করার জন্য কন্ডোলিজা রাইসের নিদান ছিল, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুক এবং ঐ অঞ্চলে সেনাবাহিনী রাখার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুক। ওয়াশিংটন অবশ্যই দৃঢ় নজর দিক ভারতের ভূমিকার উপর, ঐ অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য আনার জন্য এবং ঐ দেশকে চীন বিরোধী শক্তির জোটে নিয়ে আসার জন্য।

সোভিয়েতের পতন বা পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর যুদ্ধজোট ন্যাটোর পরিসমাপ্তি তো ঘটেই নি, পরন্তু তাকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিদেশে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ, অস্ত্র ভান্ডার বৃদ্ধি করা ও বিভিন্ন দেশের সম্পদ, বিশেষত জ্বালানি তেলের ওপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশ দখলের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ২৩২টি দেশে ৭০২টি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। মার্কিনীদের অস্ত্র ভান্ডারে রয়েছে প্রায় দশ হাজার সক্রিয় পারমাণবিক অস্ত্র, যার মধ্যে দু'হাজার প্রস্তুত রয়েছে যেকোন মুহূর্তে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য। শীতল যুদ্ধের সময়

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

শতবর্ষে ফিরে দেখা

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয় হতো, এখন সেই ব্যয় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বের জ্বালানি ভান্ডারের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একটার পর একটা তৈল সমৃদ্ধ দেশের দখল নিচ্ছে। পশ্চিম এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যের সমগ্র তৈল ভান্ডারের শতকরা ৯০ ভাগের ঠিকানা হল ছয়টি দেশ। এই ছয়টি দেশ হল সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং লিবিয়া। এই ছয়টি দেশের মধ্যে ইরান ব্যতীত সবকটি দেশের উপরই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। তাই ইরান দখল করতে এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ উদ্যোগী। একই কারণে ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী মধ্য এশিয়ার দেশগুলির তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আফগানিস্তানের দখল নিয়েছে। আফগানিস্তান সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে শক্তি সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়, ''শক্তি সম্পর্কিত বিষয়ে আফগানিস্তানের বৈশিষ্ট্য এই যে ভৌগোলিক কারণে আফগানিস্তানের অবস্থানের জন্য মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরবসাগরীয় অঞ্চলে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের এটি একটি সম্ভাব্য পথ।''

পূর্বোক্ত প্রেক্ষাপটে একথা বলা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবর্ষ পরে এই মুহূর্তে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা না থাকলেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারির বিরুদ্ধে নিয়ত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। রক্তাক্ত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, ইউক্রেন, প্যালেস্তাইন জুড়ে দেশে দেশে ছোট-বড় সীমান্তে সংঘর্ষের ঘটনা নৈমিত্তিক বিষয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যত মানুষ মারা গেছে বা গৃহহীন হয়ে পড়েছে, শতবর্ষে তার থেকে অনেক গুণ বেশি মানুষ স্থানীয় যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। আর এই সব সংঘাত সংঘর্ষের পিছনের রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আগ্রাসনের নীতি। একে পরাস্ত করতে না পারলে মহাযুদ্ধের বিপদ থেকে যাওয়ার পাশাপাশি, স্থানীয় যুদ্ধও চলবে। তাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা ও তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের। লক্ষ্য পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস। □

১৩ ফেব্রুয়ারি '১৫

১২ই জুলাই কমিটির অবস্থান বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বীমা, কয়লা ও জমি সংক্রান্ত জনবিরোধী অর্ডিন্যান্স বাতিল, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, শ্রমআইন সংশোধনী বিল বাতিল, রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদানসহ ৮ দফা দাবিতে ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে বিগত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচীটি হয় রানী রাসমনি এভিনিউতে। বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ব্যাপক শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের উপস্থিতিতে এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেও একই দিনে এই কর্মসূচী হয়।

কলকাতায় কেন্দ্রীয় অবস্থান বিক্ষোভ সমাবেশ পরিচালনা করেন অনুপ চক্রবর্তী, স্বপন চক্রবর্তী ও প্রিয় নিয়োগীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। দাবি প্রস্তাব পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, শ্রমজীবী মানুষের উপর নানা আক্রমণ নেমে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকার খুচরো ব্যবসায় এফ ডি আই চালু করতে বদ্ধ পরিকর। বীমা, কয়লাশিল্প থেকে ও এন জি সি সবক্ষেত্রেই বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টা চলছে। সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কর্মী সঙ্কোচন করে আউট সোর্সিং ও চুক্তিপ্রথায় নিয়োগ চলছে। মূল্যবৃদ্ধি যত আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে, ততই কমছে ধনী শিল্পপতিদের প্রদেয় করের পরিমাণ। বিভেদ ঘটানোর চেষ্টা চলছে ধর্মের নামে। অন্যদিকে রাজ্যের কোষাগার ঋণের ভারে জর্জরিত। কিন্তু কমতি নেই উৎসব আড়ম্বরে। বকেয়া মহার্ঘভাতা থেকে বঞ্চিত কর্মচারী-শিক্ষকগণ, বহু দপ্তরে অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন মিলছে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। এর বিরুদ্ধে আরও ব্যাপক যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে ধর্মঘটে যেতে হবে।

প্রস্তাবের সমর্থনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য। এছাড়াও প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন পীযূষ রায়, চঞ্চল ভট্টাচার্য, চিন্ময়ী দে, সমর চক্রবর্তী, নির্ভীক মজুমদার প্রমুখ। সবশেষে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত। □

কেন্দ্রীয় মহামিছিল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-যুব মহিলা বামপন্থী গণসংগঠনসমূহ তথা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৭৭ সালে এ রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। এসময়কালে কর্মচারী সমাজ পেয়েছিল ৪টি পে কমিশন, যুক্ত হয়েছিল কেন্দ্রীয় হারে ডি.এ পাওয়ার অধিকার। কিন্তু বর্তমান পরিবর্তনের সরকারের শাসনকালে সমস্ত অর্জিত অধিকারগুলি আজ হরণ করার চক্রান্ত চলছে। মহার্ঘভাতা বকেয়া ৪২ শতাংশ, ধর্মঘটের অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন করার অর্জিত অধিকার আক্রান্ত, ষষ্ঠ বেতন কমিশন / কমিটি গঠনের বিষয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার উদাসীন, নতুন নিয়োগের পরিবর্তে চলছে অবসরপ্রাপ্তদের পুনর্নিয়োগ এর সঙ্গে রয়েছে রাজ্য জুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে হামলা ও আক্রমণের ঘটনা। সংগঠনগুলিকে ভাঙ্গার জন্য কর্মী নেতৃত্বদের নিয়ম-নীতিহীনভাবে দূরদূরান্তে বদলী। সমস্ত আক্রমণের মোকাবিলা ঐক্যবদ্ধভাবে করার লক্ষ্যে তাই

রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত সংগঠনগুলি বিগত ১৪ নভেম্বর ২০১৪ মৌলালী যুবকেন্দ্রে যৌথ কনভেনশনের মধ্য দিয়ে যৌথ মঞ্চ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয় ১১-১৫ ডিসেম্বরের পাঁচদিন ব্যাপী দিন-রাত লাগাতার গণ অবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে প্রকৃতি আর প্রশাসন উভয়ের রোষকে উপেক্ষা করে কলকাতার ওয়াই চ্যানেলের কর্মসূচীতে। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক শিক্ষাকর্মীরা সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে পথে নেমে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করলেও ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি বর্তমান রাজ্য সরকারের। তাই লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে আশু দাবি আদায়ে পুনরায় পথে নামতে বাধ্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বসহ কলকাতার ৭টি অঞ্চলে সদস্যবন্ধুরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত কাকদ্বীপ থেকে ভাঙড়ের কর্মচারী বন্ধু, উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা থেকে ব্যারাকপুর, হাওড়ার পাঁচলা থেকে হুগলীর পোলবা-দাদপুর থেকে আগত কর্মচারীরা মিছিলে হেঁটেছেন সংগ্রামী মেজাজে, লাল পতাকা হাতে, দাবি পোস্টার বুকে রেখে, স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে, হেঁটেছেন উদ্যোক্তা বাকি ১৪টি সংগঠনের সদস্য বন্ধুরা। মিছিলের সুবিশাল ব্যাপ্তি যেমন ছিল নজরকাড়া। তেমনই উল্লেখযোগ্য ছিল মহিলা কর্মচারীদের উপস্থিতি, অবসরপ্রাপ্ত অগ্রজ নেতৃত্বসহ পেনশনার্স সমিতির সদস্য বন্ধুদের দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হার না মানা মনোভাব। মিছিলের শুরুতেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ বিভিন্ন মিডিয়ার প্রশ্নের উত্তরে যেমন বলেছিলেন নিজ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে, অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের ঐক্যবদ্ধ সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা আজকের লড়াইতে যেমন সমবেত হয়েছে, তেমনি দাবি না মিটলে আরও বড় লড়াইতে আগামীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হবে। এদিনের মিছিলে শামিল সাত সহস্রাধিক শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা শাসকের উদ্দেশে রানী রাসমনি রোড থেকে হাজরা পার্ক পর্যন্ত এই বার্তাই বহন করে নিয়ে গেছিল যে, দাবি আদায় না হলে সামনে দিন জোর লড়াই এবং এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা জোটবদ্ধ ভাবে প্রস্তুতি গড়ে তুলল আজকের এই মিছিলের মাধ্যমে। □

দেবাশীষ রায়

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের বক্তব্য

বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী ঃ এই মহতী সম্মেলনে যখন আমরা মিলিত হয়েছি, তখন একদিকে যেমন কেন্দ্রে হিন্দুত্ববাদী শক্তি দ্বারা পরিচালিত সরকারের আর্থিক নীতি ও সামাজিক কর্মসূচীর বিরুদ্ধে লড়াই চলছে তেমনই পশ্চিমবঙ্গে আমরা ফ্যাসিস্ট সুলভ সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর পরিসরে লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে চলেছি।

বিগত চতুর্দশ জাতীয় সম্মেলনের পরবর্তীতে প্রশাসনিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষার সংগ্রামে, নীতি বহির্ভূত বদলীর বিরুদ্ধে, বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতার দাবিতে, ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশের সুপারিশ গ্রহণ ও কার্যকর করার দাবিতে, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের দাবিতে, পিএসসি'র মাধ্যমে স্থায়ী শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে, কালা আইন ও সার্কুলার বাতিল ইত্যাদি দাবিতে বৃহত্তর পরিসরের কর্মচারীদের নিয়ে ধারাবাহিক কর্মসূচী এমনকি বিধানসভা অভিযান করা হয়। সমস্ত কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গত ১০ সেপ্টেম্বর'১৪ কলকাতা ও শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় জমায়েতের কর্মসূচী করা হয়। যা আন্দোলনে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করে।

যৌথ আন্দোলনের পাশাপাশি নব্য উদার আর্থিকনীতি, বেসরকারীকরণ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে ২টি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চরম হিংসাত্মকরূপে চাকরিচ্ছেদের অদেশনামা জারি করা হয়। এর বিরুদ্ধে ছুটির অধিকার সর্বোপরি সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

এই সময়কালে, আমরা কর্মচারী স্বার্থের দাবি নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনকে একসাথে নিয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্র তৈরি করেছি যা কর্মচারীদের দারুণ উৎসাহিত করেছে। কিন্তু, অন্যান্য বিভেদপন্থী সংগঠনের অসহযোগীতার ফলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে না পারায় পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতন হয় এমন সংগঠনসমূহ সমেত সিআইটিইউ নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলিকে নিয়ে বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা সহ জরুরী ৬ দফা দাবি নিয়ে যৌথ মঞ্চ গঠন করে গত ১১-১৫ ডিসেম্বর'১৪ পর্যন্ত লাগাতার গণ-অবস্থানের কর্মসূচী পালন করে ভবিষ্যতে বৃহত্তর লড়াইয়ের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়, যা লড়াই-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে।ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধিতে এনে ভবিষ্যতে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে অস্থায়ী/চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব দাবিকে কেন্দ্র করে পৃথক সংগঠন গঠনের প্রস্তুতি নেবে আশা করা যায়। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রণে চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের অনুরূপ সংগঠন তৈরীর ভাবনা করা প্রয়োজন।

বর্তমানে সংগঠনকে দৃঢ়ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে লড়াই-সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সর্বস্তরে ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্র প্রসারিত করা এবং বিভিন্ন স্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর ফাংশানিং বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একমাত্র ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও যৌথ চেক-আপের মধ্য দিয়েই তা করা যায়। সেই লক্ষ্যে, বিগত ৩ বছরে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে ১৯টি জেলায়, ৬৬টি মহকুমার এবং সর্বশেষ ৩৪১টি ব্লকে সফর করা হয়। একই সাথে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সাথে সদস্যভুক্তি সহ সংগঠন পরিচালনায় সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, যার ইতিবাচক প্রভাব পরে বিগত কর্মসূচীগুলিতে।

আমরা আমাদের দাবি তখনই অর্জন করতে পারব যখন সাধারণ মানুষ আমাদের দাবির পক্ষে দাঁড়াবে। সাধারণ মানুষের সমর্থন ব্যতীত কোনো দাবি অর্জন বা তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়। ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

উদ্বোধনী সমাবেশে সিআইটিইউ'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন সেন কর্মচারীদের সচেতন করা, শিক্ষিত করা, যাঁদের কাছে পৌঁছান যাচ্ছে না তাদের কাছে পৌঁছনোর যে আহ্বান রেখেছেন, তা ইতিমধ্যে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে কর্মচারীদের বর্তমান রাজনৈতিক-সামাজিক বিপদ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে জনপ্রিয় বক্তৃতামালা, রাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা শিবির ইত্যাদি করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার নয়া উদার আর্থিক নীতি কার্যকরী করা ও সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে পরিচিতি সত্তার রাজনীতির মাধ্যমে যে ভেদাভেদের ঘৃণ্য খেলায় মেতেছে পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষ আর্থিকভাবে যে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ লড়াই-সংগ্রামই এই আক্রমণ থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ।

আশা করি, এই সম্মেলন সেই লড়াইয়ের প্রকৃত দিশা দেখাবে। সবশেষে, মহারাষ্ট্র রাজ্য প্রতিনিধিরা পঃবঙ্গের ঘটনাবলীর জন্য সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে আশ্বস্ত করা হয় যে— আমরা লড়াইয়ে ছিলাম, লড়াইয়ে আছি, লড়াইয়ে থাকব। □

বিজয় শংকর সিনহা ঃ ২০০৮ সালে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে মহাসঙ্কটে পড়েছিল তা থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারে নি। এই সঙ্কট ছিল আন্তর্জাতিক

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

ক্যাশলেস

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

এ ছিল, বর্তমান আদেশনামার সেই বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। সর্বোপরি কোনো স্কীমকে বাধ্যতামূলক করা যায় না। যে কোনো স্কীমকে ঐচ্ছিক (optional) করতে হয়।

কিন্তু বর্তমান ''Cashless Medical Treatment Scheme 2014'' বাধ্যতামূলক করাটা এর নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই আমরা মনে করি।

উপসংহার ঃ বর্তমান সরকার তার দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে কর্মচারীদের অর্জিত অধিকারগুলিকে হরণ করছে এবং তাঁদের উপর অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক আঘাত নামিয়ে আনছে। এই আক্রমণকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে সমগ্র কর্মচারী সমাজ এর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে আন্দোলন সংগঠিত করছে, তখন হঠাৎ করেই কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী এই সংগঠনের সাথে আলোচনা ব্যতীত এই চটকদারী ঘোষণার সঠিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের সন্দিহান করে তুলছে। তাঁদের দাবি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দ্রুত হস্তক্ষেপ না করলে এই স্কীমের ইচ্ছামৃত্যু ঘটবে। আমরা আশা করি আমরাই পারবো অন্যান্য দাবিদাওয়া সহ এই আদেশনামাকেও কর্মচারীদের স্বার্থে সংযোজন সংশোধন করে যথার্থ রূপায়ণের জন্য সরকারকে বাধ্য করতে। □

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের বক্তব্য

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

লগ্নীপুঁজি পরিচালিত বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সঙ্কট। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বৃদ্ধির হার এখনও নিম্নমুখী। বেকারির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক পরিষেবামূলক খাতে সরকারী বরাদ্দ নির্মমভাবে হ্রাস করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, যুবরা দেশে দেশে প্রতিবাদে পথে নামছেন। অকুপাই ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট আন্দোলনে 'আমরা ৯৯ শতাংশ তোমরা ১ শতাংশ' বলে যে শ্লোগান উঠেছিল তা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশে। ইউরোপের কয়েকটি দেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে বামপন্থী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন নীতির পুঁজিবাদী বিকল্পের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনমান উন্নত করার ক্ষেত্রে সে দেশের শাসক দলগুলি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করছে।

আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত বিশ্বায়নের নীতিকে অনুসরণ করার ফলে শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকার ওপর চূড়ান্ত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রে

সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও নীতির অভিমুখে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বরং বলা যায়, ইউ পি এ-২ সরকার যে গতিতে এগোচ্ছিল তার থেকে অনেক বেশি গতিতে সংস্কারের প্রক্রিয়া চালু করছে বর্তমান বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার। বীমা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি, রেলের পরিকাঠামো নির্মাণে দেশী-বিদেশী বেসরকারী পুঁজিকে আমন্ত্রণ প্রভৃতি এই সংস্কার প্রক্রিয়ার কয়েকটি নিদর্শন। পেট্রোলের মতো ডিজেলকেও সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রিত করে দাম নির্ধারণের বিষয়টি বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। 'রেগা' প্রকল্পকে গুটিয়ে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা কার্যকরী করার উদ্যোগও শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে না। শ্রম আইনের সংশোধন করে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকারহীন করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনে শামিল হওয়ার আবেদন এই সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে রাখা উচিত। লোকসভা নির্বাচনের পরেই দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও দাঙ্গার ঘটনাও ঘটেছে।

সব থেকে বেশি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপ্রবণ রাজ্য বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ। বি জে পি ক্ষমতায় থাকার সুযোগ নিয়ে সংঘ পরিবার তাদের সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা দিয়ে সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্র। হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ এবং তার ভিত্তিতে ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে শিক্ষার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক শক্তির এই মধ্যযুগীয় কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আমাদের অনুগামী অংশকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতিও ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে রাজ্যের মানুষ বিশেষত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা অকল্পনীয় সমস্যা ও আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছেন। রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের লুম্পেন বাহিনী গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি অধিকারের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ এবং ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সর্বভারতীয় ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য, ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর শাস্তির খাঁড়া নেমে এসেছিল। একদিনের বেতন কাটা ও ডাইস-নন প্রভৃতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে আমরা সংগঠনগত ভাবে রাজ্যের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালে বিচার চেয়ে আবেদন করেছিলাম, যদিও তার ফলাফল এখনও পাওয়া যায়নি।

আমাদের সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বকে যত্রতত্র নীতিহীন ভাবে যখন খুঁশি বদলি করা হচ্ছে। লক্ষ্য সংগঠনকে ভাঙা। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙার হুমকি দিয়েছিলেন।

রাজ্যে চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে মহিলা সমাজ। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো প্রান্তে মহিলারা লুম্পেন বাহিনীর লালসার শিকার হচ্ছেন। কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে বা তাদের খুন করা হচ্ছে।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলার সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হল, শাসকদল ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নেতা ও কর্তাব্যক্তির সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া। সি বি আই তদন্তের মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যেই এমন বেশ কয়েকজনের নাম সামনে চলে এসেছে। রাজ্য প্রশাসনে শূন্য পদগুলিতে স্থায়ী নিয়োগের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ না করে অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি, কর্মসূচী পালন করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সবথেকে জ্বলন্ত দুটি দাবি, অর্থাৎ বকেয়া মহার্ঘভাতা এবং কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের অনুসরণে রাজ্যে বেতন কমিশন গঠন চূড়ান্তভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধেও কর্মচারীদের সংগঠিত করা হচ্ছে।□

সমিতি সম্মেলন ● সমিতি সম্মেলন ● সমিতি সম্মেলন

গত ১০-১১ জানুয়ারি, **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ভূমি সংস্কার কর্মচারী সমিতির ৪০তম রাজ্য সম্মেলন** উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জের নজমু নাট্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল। সকাল ১১টায় শহরের বুকে এক দৃপ্ত মিছিলের শেষে রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি সমীর পাল। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তর সম্পাদক গোপাল পাঠক।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক শুকদেব রায়। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সুনীল চ্যাটার্জী। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ চক্রবর্তী এবং এর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন দিলীপ ব্যানার্জী। ১৯টি জেলার একজন মহিলাসহ ৩৩জন প্রতিনিধি সাড়ে চার ঘণ্টা ব্যাপী প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সম্মেলনে দ্বিতীয় দিন পরিস্থিতি ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র।

সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষে সুপ্রীতি ঘোষ মজুমদার, ১২ই জুলাই কমিটির তপন চক্রবর্তী, ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী বেলা চ্যাটার্জী, শ্রমিক নেতৃত্ব বীরেশ্বর লাহিড়ী।

জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগচী। সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রগতিশীল পুস্তক বিপণীর উদ্বোধন করেন উত্তর দিনাজপুর জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক শম্ভু চক্রবর্তী। সম্মেলন উপলক্ষে স্মরণিকার বিশেষ সংখ্যার উদ্বোধন করেন সম্মেলনের উদ্বোধক গোপাল পাঠক। সমিতির প্রবীণ নেতৃত্ব অশোক ঘোষ, মানোয়ার হোসেন, প্রশান্ত রাহা এবং সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সম্মেলন মঞ্চ থেকে আগামী দু'বছরের জন্য ৬৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ২০ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। এ ছাড়া **সভাপতি**—গুরুপ্রসাদ মণ্ডল; **সাধারণ সম্পাদক**—প্রদীপ বাগচী; **যুগ্ম সম্পাদক**—প্রদীপ চক্রবর্তী এবং অতনু মিত্র; **কোষাধ্যক্ষ**—অতনু চক্রবর্তী নির্বাচিত হয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ২ জন মহিলা সহ ১৬৮ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। সমগ্র সম্মেলনটি পরিচালনা করেন সমীর পাল, গুরুপ্রসাদ মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী এবং শ্যামল ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠন **ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভে এ্যান্ড ড্রইং এম: এ্যাসো:-এর ৬৫-৬৬ তম রাজ্য সম্মেলন** গত ২৩-২৪ জানুয়ারি ১৪ সুকুমার ভৌমিক মঞ্চ ও সুশীলদাস নগর (পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তমলুক কর্মচারী ভবনে) অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জানুয়ারি সকাল ৯.৩০ মিনিটে এক বর্ণাঢ্য মিছিল তমলুক শহর পরিক্রমা করে শহীদ বেদীর সামনে ১০.৩০ মিনিটে হাজির হয়। সমিতির রক্তপতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির সভাপতি মলয় শঙ্কর ঘোষ।

এই সম্মেলনের উদ্বোধনের প্রাক্কালে ২২ জানুয়ারি বিকাল ৫.৩০ মিনিটে প্রগতিশীল পুস্তক বিপনন কেন্দ্র উদ্বোধন ও সমিতির মুখপত্র দিশারী'র বিশেষ সংখ্যা উদ্বোধন করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার-এর প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব মেদিনীপুর সাংস্কৃতিক শাখা পরিবেশিত উদ্বোধনী সঙ্গিতের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। চার জনকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়—মলয় শঙ্কর ঘোষ, বিকাশ দে, বলরাম দাস ও বিশ্বজিৎ বড়ুয়া।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবব্রত রায়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক তপন দাস ও আয়-ব্যয় পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ মোহিনী সরকার।

এই সম্মেলনে ১জন মহিলাসহ মোট ১৩৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন প্রতিবেদনের উপর ১ জন মহিলা সহ মোট ২৬ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন।

এই সম্মেলনে আগামীদিনের সংগ্রাম ও নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন তপন দাস ও সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সভাপতি চন্দন ঘোষ। এছাড়া আরো ১০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ মুখার্জী।

৬৯ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। চার জন আমন্ত্রিত সদস্যসহ মোট ১৯জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়।

আগামী ২ বছর সংগঠন পরিচালনার জন্য **সভাপতি**—সন্দীপ মুখার্জী, **সাধারণ সম্পাদক**—স্বপন নাহা, **যুগ্ম সম্পাদক**—মোহিনী মোহন সরকার, **কোষাধ্যক্ষ**—সুশান্ত বিশ্বাস, সমিতি মুখপত্র **'দিশারী'-র সম্পাদক**—চন্দন চ্যাটার্জী নির্বাচিত হন। □

জগদীশ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির ৫৬-৫৭তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৩১ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, জলপাইগুড়ি শহরে (কমরেড চুনীলাল চক্রবর্তী নগর) জেলা পরিষদ হলে (কমরেড অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে)। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে গত দুই মাস ব্যাপী ব্যাপক প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রচারের অঙ্গ হিসেবে রক্তদান, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, আলোচনা সভা, এবং সম্মেলনের আগেরদিন সন্ধ্যায় এক বর্ণাঢ্য মশাল মিছিলের আয়োজন করে শহরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

রাজ্যের সবকটি জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা ৩১ জানুয়ারি সকালে রক্তপতাকায় সু-সজ্জিত একটি মিছিল জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে জেলাপরিষদ হলের সম্মুখে শহীদবেদীর সামনে এসে উপস্থিত হয়। সমিতির রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির সভানেত্রী জলি বাগচী। এর পর একে একে অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ মাল্যদান করেন। সম্মেলনের কাজ শুরু হয় জলপাইগুড়ি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখার উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে। স্থায়ী সভানেত্রী জলি বাগচী সহ দিবাকর মিরবহর ও গৌরাঙ্গ রায়কে নিয়ে সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয়। এরপর কমরেড জলি বাগচী শোকপ্রস্তাব পেশ করেন এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক শক্তি দাস মুখোপাধ্যায় তার ভাষণ দেন।

রাজ্য সম্মেলনকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য।

সম্মেলনে উপস্থিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মনোজকান্তি গুহ তাঁর ভাষণে সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন।

সম্মেলনের ক্রেডেনশিয়াল রিপোর্ট পেশ করেন কিংশুক বিশ্বাস। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে 'ভূমিজ' পত্রিকার প্রকাশনা এবং বুকস্টলের উদ্বোধন করেন সুমিত ভট্টাচার্য। এই সম্মেলনে মোট ২৯৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, এর মধ্যে ২৪জন মহিলা। সম্মেলনে নতুন সম্পাদকমণ্ডলী সহ ৯৭ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। **সভাপতি**—জলি বাগচী, **সাধারণ সম্পাদক**—অনুপ বিশ্বাস, **যুগ্ম সম্পাদক**—সুপ্রিয় ব্যানার্জী, **কোষাধ্যক্ষ**—গোবিন্দ লাল ছাটুই, **'ভূমিজ' পত্রিকা সম্পাদক**—সুগত দাস নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। □

সুগত দাস

গত ১০ এবং ১১ জানুয়ারি ২০১৫ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে **ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যানিমাল হাসব্যান্ড্রি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন** সুশীল দাস নগরে ভবতোষ রায় মঞ্চে (বর্ধমান জেলায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মচারী ভবনে) অনুষ্ঠিত হয়। ১০ জানুয়ারি ২০১৫ দুপুর ২টোয় রক্তপতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। এই সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য্য। পরবর্তীতে সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক কালীপদ দত্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উত্থাপন করেন এবং বিগত দু-বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন অজিত ঘোষ। সম্মেলন মঞ্চে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, রাজ্যে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে এবং ডেয়ারী শিল্পকে বেসরকারীকরণ সহ ১০টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবগুলির সমর্থনে ব্যাখ্যা সহ বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক অভিজিৎ রায় চৌধুরী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপরে দুইজন মহিলা সহ মোট ২৩ জন বক্তব্য রাখেন। সমস্ত বক্তব্য গুটিয়ে জবাবী ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অমল সরকার। সম্মেলন মঞ্চে প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। ৬০০০ টাকার বই প্রতিনিধিরা ক্রয় করেছেন। এই বুক স্টল উদ্বোধন করেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রণব আইচ। সম্মেলনে প্রতিনিধি সহ মোট ২০৩ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সভাপতি অসিত গায়েন, সহ-সভাপতিদ্বয় চিত্তরঞ্জন দাস, জয়ন্ত ভৌমিককে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলন থেকে নির্বাচিত হন—**সভাপতি**—অজিত ঘোষ, **সাধারণ সম্পাদক**—অভিজিৎ রায় চৌধুরী, **যুগ্ম-সম্পাদক**—সুকুমার বেরা, নারায়ণ চন্দ্র দে, **কোষাধ্যক্ষ**—অরূপ পাল। সম্মেলনে অবসররত নেতৃত্বকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই সম্মেলনে সংগঠনের বিশেষ স্মারক প্রকাশিত হয়। আহ্বায়ক সুকুমার বেরা কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা হিমাংশু রায়ের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে স্মারকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরিশেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। □

আলোচনা সভা

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে **ওয়েস্ট বেঙ্গল নন-মেডিক্যাল টেকনিক্যাল এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন**-এর ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড সত্য ভট্টাচার্য্য স্মারক বক্তৃতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ''ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উৎস ও বিপদ'' শীর্ষক আলোচনা সভায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল বাশার।

সভার শুরুতে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক। পরবর্তীতে আলোচক আবুল বাশার সাম্প্রদায়িকতার উৎসমুখ ও ভয়াবহতার দিকগুলি তুলে ধরেন। সভায় প্রায় তিন শতাধিক কর্মচারী সহ কর্মী নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতি স্থায়ী সভাপতি প্রলয় কুমার পাল। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 10th Issue, February 2015

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

ডব্লিউ এফ টি ইউ-এর ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশন্যাল পাবলিক সার্ভিসেস-এর ১২তম কংগ্রেসে বেসরকারীকরণ ও পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে সার্ভিস সেক্টরে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই সংগ্রাম জারি রাখার আহ্বান

বিজয় শংকর সিন্‌হা
সহ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

ডব্লিউ এফ টি ইউ-এর ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল (টি ইউ আই) পাবলিক সার্ভিসেস-এর ১২তম কংগ্রেস ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরে মানাঙ্গ হোটেলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

লেখক সহ এদেশের আরও কয়েকজন প্রতিনিধি

নেপালে সরকারী কর্মচারীদের ৪টি সংগঠন [১। এন ই জি ই ও (মেইন হোস্ট), ২। পি ই ই এ এল (কো হোস্ট), ৩। এন এ এইচ ই পি (কো হোস্ট), ৪। এল এইচ পি (কো হোস্ট)] কনফেডারেশন অব নেপালিজ-প্রোফেশন্যালস্ (সি ও এন ই পি)-এর উদ্যোগে ১২তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষে ১০ জন প্রতিনিধি ১২তম কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ কলকাতা ও দিল্লী বিমানবন্দর থেকে তাঁরা ৩.৩০ মিনিটে কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দরে পৌঁছালে সেখানে অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে লাল উত্তরীয় পরিয়ে প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এবং পরে গাড়িতে কাঠমাণ্ডুর একাধিক আধুনিক হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সন্ধ্যে ৭.৩০ মিনিটে মানাঙ্গ হোটেলের ৬ তলার একটি হলে অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে চেয়ারম্যান হীরা নেপাল স্বাগত ভাষণ দেন। এবং টি ই ইউ আই লেখা লাল উত্তরীয় উড়িয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানান হয়।

পরে মানাঙ্গ হোটেলে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিরা সুসংবদ্ধভাবে রাতের ডিনার করেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ বেলা ১১টায় পারিখ টুডিখেল থেকে প্রতিনিধিসহ নেপালের সহস্রাধিক সরকারী কর্মচারীদের সুসজ্জিত বিশাল মিছিল কাঠমাণ্ডু শহর পরিক্রমা করে। মিছিলের সামনে নেপালের সংস্কৃতি সানাই ও ঢোল বাজানোর পাশাপাশি নাচতে নাচতে মিছিল চলেছে যা অভূতপূর্ব দৃশ্য। রাস্তায় নেপালের মানুষ ব্যাপক পুষ্পবৃষ্টি ও রেড স্যালুটের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা জানান। মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে দেখা গেল নেপালের টি আর সেন্ট্রাল কলেজে ফেস্টুন টাঙানো তাতে 'চে গুয়েভারার' ছবিসহ লেখা 'জনযুদ্ধ জারি ছে' মানে মানুষের সংগ্রাম জারি আছে যা দেখে মিছিল আরো স্লোগান মুখর হয়ে উঠলে কলেজের ছাত্ররাও দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা জানায়। প্রায় ১ ঘণ্টা কাঠমাণ্ডুর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমণ করে নেপাল একাডেমি হলে মিছিল পৌঁছায়।

নেপাল একাডেমি হলে প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। নেপাল পার্লামেন্টের কমিউনিস্ট পার্টির (নেপাল) চেয়ারপার্সন কে পি শর্মা প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখন। এছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি লুলা মিলে সুতাকা, নেপালের মন্ত্রী লালবাবু পণ্ডিতসহ ডব্লিউ এফ টি ইউ-এর নেতৃত্ব অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। ১২তম কংগ্রেসে সম্মেলন সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এছাড়া ৫জন নেপালের সংগঠনের সংগঠক, মাউন্ট এভারেস্টে উঠে যে ডব্লিউ এফ টি ইউ পতাকা তুলে ধরেন তার অডিও ভিস্যুয়াল হলে দেখানো হয় এবং পরে ৫ জন মাউন্ট এভারেস্ট জয়ীকে প্রকাশ্য অধিবেশনে সংবর্ধনা জানানো হয়।

এরপর প্রকাশ্য অধিবেশনে ডব্লিউ এফ টি ইউ-র সেক্রেটারি জেনারেল জর্জ মার্ভিকস প্রেরিত শুভেচ্ছাবার্তা পাঠ করা হয়। সভাপতি লুলা মিলে সুতাকাকে অধিবেশনে সংবর্ধনা জানানো হয় এবং প্রকাশ্য অধিবেশনের পর্ব শেষ হয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, ১২তম ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টার ন্যাশনাল কংগ্রেসের (ডব্লিউ এফ টি ইউ) পাবলিক সার্ভিসেস এমপ্লয়িজ অ্যান্ড অ্যালায়েড (টি ইউ আই পি, এস ই এ) উদ্বোধন করেন নেপালের বিশিষ্ট মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ ডঃ বিজয় কুমার পাওয়েল। ১২তম কংগ্রেসের মূল আহ্বান "Against Privatisation & Capitalist reforms Public Services for the People" এই বিষয়ে মূলত তিনি বক্তব্য রাখেন। তিনি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির দাপট ও শ্রমিক কর্মচারীসহ শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণের দিকগুলি বক্তব্যে তুলে ধরেন। দেশে দেশে শ্রমিক কর্মচারীদের যে বড় বড় সংগ্রাম আন্দোলন হচ্ছে সেগুলিও ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে। এবং শ্রমিক কর্মচারীদের বাঁচাতে সংগ্রাম করতে হবে। সমাজতন্ত্রই একমাত্র সিংহভাগ মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারে। সমাজতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধভাবে লাগাতার সংগ্রামে যুক্ত থাকতে আবেদন জানান।

১২তম কংগ্রেসে ৯টি দেশ থেকে ৪৬টি সংগঠনের পক্ষে ১২০জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া নেপালের পক্ষে প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা কমিটিসহ ৫০জন উপস্থিত ছিলেন।

১২তম কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সভাপতি লুলা মিলে সুতাকা ড্রাফট ডিক্লারেশনের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং প্রতিনিধিদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য বলেন। ৩জন মহিলাসহ ৩৪ জন প্রতিনিধি স্ব স্ব দেশের সংগ্রাম আন্দোলনসহ বিশ্বে পরিস্থিতি চাহিদা অনুযায়ী সংগঠনকে মজবুত করা ও ঐক্যবদ্ধভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সংগ্রাম আন্দোলনে যুক্ত থাকার লক্ষ্য অটুট রাখার উল্লেখ করেন। ভারতের পক্ষে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে এস শ্রীকুমার, এম কৃষ্ণণ ও পি অভিমন্যু।

নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাধব নেপাল (কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল) ১২তম কংগ্রেসে আগত প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জাগিয়ে নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম আন্দোলন এবং নেপালের পার্লামেন্টে তাদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ

শেষে সভাপতি লুলা মিলে সুতাকা সংক্ষিপ্ত জবাবী বক্তব্য রাখেন। পরে ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনালের ড্রাফট ডিক্লারেশন ও গণতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব রাখেন এবং সভায় হাত তোলার মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।১২তম কংগ্রেস থেকে ঘোষিত সিদ্ধান্ত সহ ৮ দফা দাবিকে সামনে রেখে আগামীতে সারা বিশ্বে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রাম আন্দোলন সংগঠিত করার শপথ নেওয়া হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তরের হলে সকাল ১০টায় প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাধব নেপাল ও বর্তমান পার্লামেন্টের চেয়ারপার্সন কে. পি. শর্মা প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রতিনিধিদের জন্য নেপালের এক বৃহৎ হোটেলে লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সার্ভিসেস-এর ১২তম কংগ্রেস থেকে সভাপতি আরতুর সাকুইরা (পর্তুগাল)। জেনারেল সেক্রেটারি পিয়ারপাওলো লিয়োনার্ডো (ইতালি), ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি এ. শ্রীকুমার রাও সহ ৫ জন সহ-সভাপতি-সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। তাছাড়া ১৩জন ডাইরেক্টিভ কমিটিতে ও ৯ জন ফাইনান্সিয়াল কন্ট্রোল কমিটিতে নির্বাচিত হন।

(সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল)

১. এ. শ্রীকুমার (কেরালা), ২. মঞ্জুল দাস (বিহার), ৩. সুনীল যোশী (মহারাষ্ট্র), ৪. বেদ প্রসাদ (পাঞ্জাব এফি), ৫. শুকদেব সাইনি (পাঞ্জাব ইনভাইটি), ৬. জি. দেবীপ্রসাদ রাও (তেলেঙ্গানা), ৭. এ. অশোক বাবু (অন্ধ্রপ্রদেশ), ৮. হিমাংশু সরকার (প.ব.), ৯. শ্রীমতী সাউ (ওড়িশা), ১০. বিজয় শংকর সিনহা (প.ব.)। □

মহাকরণে সংগঠন দপ্তর সম্পর্কে আদালতের নির্দেশ

মহাকরণের অভ্যন্তরে সংগঠন দপ্তর

রাজ্য প্রশাসনের কেন্দ্র সম্প্রতি মহাকরণ থেকে হাওড়া জেলার নবান্নে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রশাসন কেন্দ্র স্থানান্তরিত করার কারণ হিসেব বলা হয়েছে, মহাকরণ ভবনটির সংস্কারসাধন করা হবে। সংস্কারসাধনের কাজ শুরুও হয়েছে।

মহাকরণের অভ্যন্তরে সংগঠনের একটি দপ্তর রয়েছে, যা গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। কয়েকদিন আগে পি ডব্লু ডি-র পক্ষ থেকে সংগঠনকে মৌখিকভাবে জানানো হয় যে, সংস্কারসাধনের জন্য ঐ দপ্তরটি এবং তার সংলগ্ন আরও কয়েকটি ঘর ভেঙে ফেলা হবে। ফলে দ্রুত তা খালি করে দেওয়া প্রয়োজন। সংগঠনের পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ পি ডব্লু ডি-র প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারির কাছে চিঠি লিখে জানানো হয়, সংস্কারের কাজের স্বার্থে ঘর ছেড়ে দিতে সংগঠনের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে এই আশ্বাসটুকু দরকার যে সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হলে পুনরায় ঐ ঘরটি সংগঠনকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং সংস্কারের কাজ চলাকালীন আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি বিকল্প ঘরের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, বিকল্প ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় এবং সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হলে ঘর ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তবে কোনো আশ্বাস দেয়া সম্ভব নয়। তখন সংগঠনের পক্ষ থেকে বাধ্য হয়েই কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন ফাইল করতে হয়। সেই রিট পিটিশনেও একই বক্তব্য জানানো হয়।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি ড. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর ঘরে মামলাটি শুনানি হয়।

সংগঠনের পক্ষে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। রাজ্য সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী লক্ষ্মী গুপ্ত। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মাননীয় বিচারপতি রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেন সংস্কারের কাজ চলাকালীন মহাকরণের অভ্যন্তরে অথবা সংলগ্ন কোনো জায়গায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে একটি বিকল্প ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং এর জন্য আদালত রাজ্য সরকারকে এক সপ্তাহ সময় দেয়। পাশাপাশি আদালত একথাও বলে যে, সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হলে কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে তার জায়গা ফিরিয়ে দিতে হবে। আদালতের এই ইতিবাচক হস্তক্ষেপে স্বভাবতই সর্বস্তরের কর্মী-কর্মচারীরা খুশি। কারণ দপ্তর ব্যতিত সংগঠনের কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।